লোকগীতির সমাজতত্ত্ব

ড. আবদুল ওয়াহাব*

সার সংক্ষেপ

[সঙ্গীত এবং সুর সংস্কৃতির অন্যতম মৌল উপাদান। সমাজের উত্থান-পতনের টানাপোড়েনে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সঙ্গীতের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি হয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। সবুজ শ্যামল বাঙলার প্রকৃতি, নদীমাতৃকতা, বন-বনানী, পাহাড়-পর্বত, হাওড়-বিল নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক পরিবেশ-পরিমন্ডল, ষড়ঋতুর বৈচিত্র্যতা দেশের মানুষের উপর যে প্রভাব ফেলেছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এদেশের সঙ্গীত তথা বিচিত্র প্রকৃতির লোকগীতিতে। বাংলাদেশের সঙ্গীতের নিজস্ব ঐতিহ্য এদেশের লোকগীতি। প্রাগৈতিহাসকাল থেকে এ ঐতিহ্য চলে এসেছে। লোকগীতির উৎপত্তির ক্ষেত্রে একটি সংহত সমাজ ক্রিয়াশীল। যে সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিদ্যমান ; এমন একটি সুসংহত ও বিকাশমান সমাজেই লোকগীতির উৎপত্তি ঘটে। লোকগীতি সৃষ্টির মূলে রয়েছে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মজীবী মানুষ-রয়েছে কামার-কুমার,তাঁতি-ধোপা, জেলে-মাঝি, কৃষক, গাড়োয়ান। তাই লোকগীতিতে তাদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। ফুটে উঠেছে সমাজকাঠামোর বা মানুষের পারস্পারিক সম্পর্কের স্বরূপ।

সমাজবিজ্ঞানের দায়িত্ব সমাজ কাঠামোর মূল্যায়ন, সমাজের বিকাশ, বিবর্তন ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশ্লেষণ। যুগে যুগে সঙ্গীত তথা শিল্পকর্মে সমকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগেরই শিল্পকর্মে সে যুগের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। বন্য যুগ, পশু পালন ও যাযাবর যুগ, দাসযুগ, সামন্ত বা মধ্যযুগীয় কাল থেকে আজ পর্যন্ত শিল্পকর্মে ধারাবাহিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তা থেকে সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে সঙ্গীতের সামাজিক দায়বদ্ধতা বা গণচেতনার স্বরূপটি প্রকাশ হয়। লোকগীতিতে সমাজজীবনের প্রকাশ ঘটে কখনো স্পষ্ট, কখনো রূপকের অন্তরালে কিংবা তত্ত্বের ছদ্মবেশে। বিশুদ্ধ শিল্প-প্রেরণার কিংবা নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টির কারণে লোকগীতির জন্ম নয়। এর পশ্চাতে রয়েছে মানবতাবাদী ভাবনা, জীবন-অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাবোধ। সঙ্গীতের সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে গানের "জন্ম এবং পুনঃজন্মের" বিষয়টি বিচার্য। একটি সঙ্গীত কালের চিত্র বুকে ধারণ করে বয়ে চলে কাল থেকে কালান্তরে । পুনঃসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় কোনো শিল্পী যখন উপযুক্ত স্থান-কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার গানে 'আপন মনের মাধুরী' সংযোজিত করতে পারে, তখন সেই গান নিছক বক্তব্য বিষয়ের সীমাকে অতিক্রম করে যায়, তাতে সংযোজিত হয় নতুন মাত্রা। এভাবে সঙ্গীত রচনাকার, সুরকার এবং কালে কালে এর পরিবেশনের, উপস্থাপনের বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে সঙ্গীত সমাজ কাঠামোকে বিশ্লেষণের সুযোগ এনে দেয়। বর্তমান নিবন্ধে বাঙলার লোকগীতিতে সমাজ কাঠামোর স্বরূপ বিশ্লেষণের প্রয়াস নেয়া হয়েছে।]

Sociology of Folksong

Synopsis

Music is one of the basic elements of culture. As an integral part of culture, music is created and developed on the warp and woof of the ups and downs of society. Bangladesh is not an exception in this regard. The greenery, rivers, forests, hills, fields and marshy areas and the ever changing nature of Bangladesh have greatly influenced the life of its people, which is nicely reflected in its music, particularly in its folksong. The folksong is the main tradition of Bengali music. This has been continuing since its prehistoric period. Folk music is originated in a stable and harmonious society. The common people from various occupations such as blacksmiths, potters, weavers, washer men and women, fishermen, boatmen, farmers and coachmen are the creators of this traditional music.

* পরিচালক, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

Their experiences, feelings, emotions, and passions have found a successful expression in it. Social structure and human relationship have been expressed in it.

Social Science deals with evaluation of social structure, social development, social reformation and analyses of cultural history. The contemporary social aspects have been depicted in music as well as in artistic works. Works of every historical era reflect the characteristics of that time. A historical analysis of different eras since the long past shows that the social responsibility or mass awareness in folk music has always been manifested along with the changes of society. Society is sometimes mirrored in folksong explicitly, sometimes symbolically and sometimes theoretically. Folksong is not made for its art's sake only. There lie humanistic approach, experience and reality in it. The `birth and rebirth' of folk music can be considered in its social context. A song continues from time immemorial with the traits of society depicted into it. When a musician recreates a song, a new dimension is added to it beyond its content. Thus music gives an opportunity to analze it from the context of its presentation over the ages. This paper looks at the analysis of social implications in Bengali folksongs.

লোকের গীতি হচ্ছে 'লোকগীতি'। 'লোক' কারা ? একটি সুসংহত ও সুসংগঠিত জনগোষ্ঠীর আমজনতা বা সাধারণ জনতার প্রত্যেকে এক একটি 'লোক'। কোনো পাড়া বা মহল্লা, গ্রাম, নগর বা শহর, কোন নৃ-গোষ্ঠী বা কোনো দেশের সাধারণ জনতার সংহতি থেকে 'লোক' অভিধাটি বিবেচ্য। এই সংহত সমাজের যে মত সেটা হচ্ছে বহুত্ববাচক। তাদের যে বেদনা, কান্না, আশা, আকাঙক্ষা– তা সম্মিলিত, সবার। তাদের আছে আনন্দ-উচ্ছ্বস,আছে ভয়-ভীতি, আছে নিপীড়ন-নির্যাতন, জীবন যন্ত্রণা, জীবন সংগ্রাম ; তাদের আছে বাঁচার অভিলাষ, ভালোভাবে বাঁচার, সকলে মিলে বাঁচার, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচার সম্মিলিত প্রয়াস।[১]

আমরা জানি, মানুষ মানেই শিল্পী মানুষ, জ্ঞানক্ষম মানুষ, Homo sapiens. তার রয়েছে সৃজনশীলতা, কবি মন-ভাবুকতা। তার বেদনা এবং আনন্দ, আশা এবং হতাশা তাকে ঘিরে সর্বদাই বিরাজিত। আর এই যে সংহত সমাজ, সম্মিলিত সমাজ,'লোকসমাজ' তার চাহিদা , চিন্তা এবং আকাঙক্ষার মিলিত রূপের কাব্যিক প্রকাশ লোকগীতি।

গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী মানুষ, চাষি, মাঝি, তাঁতি, কর্মকার, ক্ষৌরকার, রাখাল, রিকসাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, গারোয়ান, বেদে-বেদেনি, ভিখারি-ভিখারিণী স্বীয় অন্তরে সঙ্গীত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গান রচনা করে, গান গেয়ে বেড়ায়। চাষি নির্জন পল্লীর প্রান্তরে গাছের ছায়ায় অলস মধ্যাহ্নে আপন মনে বাঁশি বাজায়, বেদেরা নদীর ঘাটে নৌকা বেঁধে মনের আনন্দে বাঁশি বাজায়, গান গায়। মাঝি ভাটার স্রোতে অথবা নৌকায় পাল তুলে নৌকা ভাসিয়ে বিগলিত চিত্তে নিজ জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি ও আশা-আকাঙক্ষার স্বপ্নে বিভোর হয়ে উদাস সুরে আত্মহারা হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে সকলেই গায়ক আর সকলেই শ্রোতা। অর্থাৎ সঙ্গীতের শিল্পকলা এদের যত না আকৃষ্ট করে তারও বেশি এদের কাছে যা অর্থবহ মনে হয় তা হলো সঙ্গীতের মাধ্যমে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের অনুভূতিরই আত্মপ্রকাশ। সাঙ্গীতিক শিক্ষা-দীক্ষার অভাব সত্ত্বেও গ্রামীণ জনসাধারণের অনেকেই সঙ্গীত পরিবেশনায় স্বভাবজাত দক্ষদা ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করে থাকে। এজন্য তাদেরকে কোনো ওস্তাদ বা গুরুর কাছে আনুষ্ঠানিভাবে সঙ্গীত শিক্ষা লাভের প্রয়োজন হয় না। স্বীয় পরিবেশে পরিমন্ডলে প্রতিবেশী কিংবা সমাজের অপরাপর গায়ক-বাদকের সঙ্গীত পরিবেশন শুনে এরা মুখে মুখে গান শিখে নেয়ে। এরূপ সাধারণ পরিস্থিতি ও পরিবেশে গান আয়ত্ত করলেও স্বভাবজাত সাঙ্গীতিক চেতনা ও তীক্ষ্ণ অনুভূতির গুণে অনেকে দক্ষ সঙ্গীতজ্ঞের ন্যায় বিশিষ্টতা অর্জন এবং সুখ্যাতি পায়। গ্রাণীণ লোকসাধারণের এ জাতীয় সহজ ও সরলভাবে সঙ্গীত সৃষ্টিও পরিবেশনাই বাঙলার লোকগীতি (Folksong)।[২]

বাংলাদেশের সঙ্গীতের নিজস্ব ঐতিহ্য এ দেশের লোকগীতি। প্রাগ-ইতিহাসকাল থেকে এ ঐতিহ্য চলে এসেছে। পন্ডিতদের বিশ্লষণে একথা বলা হচ্ছে যে, পরিশীলিত সঙ্গীত এবং লোকগীতি সুপ্রাচীন কাল থেকে পরস্পরের

সঙ্গে সম্পৃক্ত। লোকগীতি যেমন বাঙলার চিরায়ত সঙ্গীত তেমনি পরিশীলিত সঙ্গীতও বাঙলার হাজার বছর ধরে লালিত সঙ্গীত ধারারই অঙ্গ। লোকগীতি যেমন গ্রামীণ মানুষের সহজ-সরল হৃদয়ানুভূতির কথা বলে, পরিশীলিত সঙ্গীতেও রয়েছে তার আভাস। অর্থাৎ এ কথা সত্য যে, লোকগীতি লোকায়ত বাঙলার আদি এবং অকৃত্রিম হলেও উপভ সঙ্গীতই একে অপরের পরিপূরক রূপে সহাবস্থানে থেকে রেল লাইনের মতো সমান্তরাল গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমরা যদি বলি বাঙলার লোকগীতি চিরায়ত সঙ্গীত, মুখ্যতও তাই; এ ক্ষেত্রে একই সঙ্গে বলতে হয়, পরিশীলিত সঙ্গীতও বাঙলার আবহমান কালেরই সঙ্গীত।

লোকগীতিতে রয়েছে বাঙলার মানুষের প্রাণের স্পন্দন । গ্রামীণ লোকসাধারণ বিশেষ সময়ে, বিশেষ মুহূর্তে, তাদের মনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ধর্মচিন্তা, তাদের লৌকিক ক্রিয়াকর্ম, আকস্মিক ঘটনা-দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়-ঝঞ্ঝ, বন্যা-দুর্ভিক্ষ, মহামারী, অতিপ্রকৃত-অতিন্দ্রীয় চিন্তা-চেতনা, রোগ-শোক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি প্রভৃতির ক্রিয়া-প্রক্রিয়া তাদের স্ব স্ব আঞ্চলিক ভাষায় ছন্দবদ্ধভাবে সাজিয়ে তাদের যে আকাঙ্ক্ষা, অনুভূতি ও আকুতি প্রকাশ করে সেটাই লোকগীতি। আদিতে লোকগীতি লিখে রাখায় প্রচলন ছিল না; বংশ পরম্পরায় এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষে মুখে মুখে, এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে প্রবাহিত হতো।

সাধারণভাবে লোকগীতি অর্থ বহুকালব্যাপী জনগণের মধ্যে জনগণের সাহায্যে লিখিত স্বতঃপ্রণোদিত সুরে মুখে মুখে প্রচারিত গান। আধুনিককালে লোকগীতির অর্থ অনেক বিস্তৃত। এখন বলা হয় না যে লোকগীতি কোনো এককালে সৃষ্টি হয়েছিল, এখন আর তা সৃষ্টি হচ্ছে না কিংবা হবে না। লোগগীতি একক ব্যক্তি দ্বারা হতে পারে, আবার সমষ্টির প্রচেষ্টায় হতে পারে। এটি লিখিত হতে পারে, আবার অলিখিতও হতে পারে। একটি গতিশীল ও সংহত সমাজে লোকগীতি সবসময়ই সৃষ্টি হতে পারে। তবে কোন একটি গীতি একক ব্যক্তি দ্বারা সূচিত হলেও একাধিক ব্যক্তির মাধ্যেমে এর সংযোজন হতে পারে, আবার বিয়োজন হতে পারে। এভাবে পরিমার্জিত হয়ে লোকপরম্পরায় একটি গীতি পরিচিতি পায় এবং সমাজে দীর্ঘস্থায়ী আবেদন লাভ করে।

লোকগীতি উৎপত্তির ক্ষেত্রে একটি সংহত সমাজের কথা বলা হয়েছে। এই সংহত সমাজ সলতে বোঝায়, যে-সমাজ তার অন্তর্ভূক্ত মানবগোষ্ঠীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্য দিয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলে। একটি সুসংহত ও বিকাশমান সমাজেই কেবল লোকগীতির উৎপত্তি ঘটে। অর্থাৎ ঐ সুসংহত সমাজমানসই সৃষ্টিশীলতার জন্য প্রেরণাদায়ী। অর্থাৎ সমাজমন উন্মুখ হয়ে থাকবে কিছু বলার জন্য ; কিছু শোনার জন্য-ব্যক্তি নিজে সেখানে অংশীদারিত্ব নিবে। সুতরাং ব্যক্তির মননশীলতার সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে সমাজ সম্পৃক্ত মননের প্রেরণা। অর্থাৎ গীতি রচনা ও পরিবেশনা দুটোই সংঘটিত হচ্ছে সমাজমনের বা সমষ্টির প্রণোদনায়।

লোকগীতির পরিচয় তার কথ্য ভাষার প্রয়োগে। লোকগীতি সবসময় সরল ছন্দে রচিত। এর সুরও অতি সাধারণ। কিন্তু সে সুর অনেকটাই নির্দিষ্ট। লোকগীতিতে কাহিনী থাকে না। আর থাকলেও তা অত্যন্ত শিথিল থাকে। সহজ-সরল ভাব ও সুর লোকগীতির প্রাণ। আধুনিককালে লোকগীতি গবেষণার গুরুত্ব বেড়েছে। করণ এর কথা ও সুরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় জাতির চিন্তা-চেতনা,ধ্যান-ধারণা ও ঐতিহ্য। জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক চেতনা, মানুষের প্রতি সংবেদনশীলতা, হাজার বছর ধরে লালিত সমাজ-ইতিহাসের পারম্পর্যতার ইঙ্গিতবাহী লোকগীতি যে কোনো সমাজ ও জাতি-গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক গবেষণার বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। মানুষের জাতিতাত্ত্বিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উন্মোচন করছে লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা এই লোকগীতি। এজন্য সমগ্র দুনিয়ায় আজ লোকগীতি সংগ্রহ ও গবেষণায় সাড়া পড়েছে।

লোকগীতি বাঙলার মানুষের প্রাণ। তাই মানুষের কাছে এ সঙ্গীতের আবেদন চিরায়ত। এ সঙ্গীতে রয়েছে লোকায়ত মানুষের প্রাণের ছোঁয়া। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতি, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা। গ্রামীণ ও সাধারণ জনগোষ্ঠীর প্রাণের দোলা লোকগীতির মূল প্রতিপাদ্য। এ গান সৃষ্টির মূলে রয়েছে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মজীবী মানুষ-রয়েছে কামার, কুমোর, তাঁতি-ধোপা, জেলে, মাঝি-মাল্লা, কৃষক-গাড়োয়ান। এ সঙ্গীত

সৃষ্টির মূলে রয়েছে পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল। ব্যবহারিক প্রয়োজন ও আঞ্চলিকতা ভেদে এ সঙ্গীতের রয়েছে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই কোণে, বঙ্গ ব-দ্বীপে রয়েছে অসংখ্য নদীবিধৌত উর্বর কৃষিভূমি। ভূ-প্রাকৃতিক, ভৌগলিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণে বাঙলায় লোকগীতির এক সমৃদ্ধতম ভান্ডার গড়ে উঠেছে। হাজার বছর ধরে আচরিত লোকধর্ম, ইসলামের সাম্যের বাণীর অনুপ্রেরণা, বৌদ্ধউর্বর সমাজমন, বৈষ্ণব সহজিয়া, ভারতবর্ষে হাজার বছর ধরে আচরিত যোগতন্ত্র, ভক্তিবাদ-এর সঙ্গে ইসলামের উদারনৈতিক মতপদ্ধতি সুফি ও মরমিবাদের সমন্বিত চেতনা, সমন্বিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রণীত হয়েছে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকগীতি-মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশে সমাজ মনে এনেছে কর্মচঞ্চলতা ও কাব্যিক প্রেরণা। মানুষের মনে বেজে উঠেছে সুরের ঝঙকার । সে তার মনের প্রেরণায় গান রচনা করেছে, তাতে কণ্ঠ দিয়েছে। সে পেয়েছে এই জল-হাওয়ারই সৃষ্ট লোকায়ত বাঙলার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিহীন অসংখ্য মননশীল সমঝদার, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বাঙলার আবালবৃদ্ধবণিত অসাম্প্রদায়িক চেতনাশক্তি লোকমানস তাদেরই লোককবি দ্বারা সৃষ্ট এই লোকগানকে তারা স্বাগত জানিয়েছে-তারা এই লোকগানের সঙ্গে নিজেদেরকে একাত্ম করেছে, তারা এর সঙ্গে আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে ; তারা তাদের মনের মাধুরী দিয়ে কখনও কখনও এর সংযোজন-বিয়োজন করেছে-এভাবে তারা আপন আপন অস্তিত্ব , চিন্তাদর্শ আবিষ্কার করেছে হাজার বছর লালিত লোকগীতির মধ্য দিয়ে। এভাবে গড়ে উঠেছে লোকগীতির বিশাল ভান্ডার।[৩]

লোকগীতি (Folksong) গ্রামীণ লোকসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা,আশা-নিরাশা, সুখ-দুঃখ, সর্বোপরি জীবন সংগ্রামের এবং সেই সঙ্গে জীবনবাদী ও জীবনমুখিনতার গীতিময় প্রতিচ্ছবি। আমরা সচরাচর আয়নায় (Looking-glass) যেমন মুখচ্ছবি দর্শন করি, লোকগীতি তেমনি লোকসাধারণকে দেখার আয়না ; এই আয়নায় লোকসাধারণের হৃদয়ক্ষরণ, হৃদয়ের আকুতি, হৃদয়ের জ্বালা-যন্ত্রণা, বেঁচে থাকার বাসনা, অধিকারের প্রশ্ন প্রতিম্বিত হয়। অর্থাৎ লোকগীতি হচ্ছে গার্হস্থ্য জীবন তথা শ্রমজীবী মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ, কর্মজীবী মানুষ-কৃষক, জেলে, তাঁত, মাঝি, গাড়োয়ান, ঠেলাওয়ালা, রিকসাওয়ালা প্রভৃতি মানুষের মনের কথার সহজ সুরের কাব্যরূপ।

এই আয়নায় শিকড় সন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দর্শনার্থী দেখতে পারেন দেশ-কাল, সমাজ-সংস্কৃতির হাজার বছরের প্রতিচ্ছবি, ভিন্ন ভিন্ন লোকসমাজ, তাদের মন-মানস, চিন্তা-চেতনা, তাদের জীবনদর্শন, পার্থিব অপার্থিব চিন্তা, বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদার পরিমাণ, তাদের সংস্কৃতি, তাদের প্রাত্যহিক জীবন অর্থাৎ তাদের জীবন সংগ্রামের সর্বমোট পরিচয়। গ্রামীণ জনসাধারণ বিশেষ সময়ে, বিশেষ মুহূর্তে তাদের মনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ধর্মচিন্তা, তাদের লৌকিক ক্রিয়া-কর্ম, সমাজের ঘটনা-পরম্পরা, আকস্মিক ঘটনা-দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়-ঝঞ্জা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, রোগ-শোক, মহামারি, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদি,আর্থ-সামাজিক অবস্থা কর্মকান্ড প্রভৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রয়া তাদের স্ব স্ব আঞ্চলিক ভাষায় সাজিয়ে ছন্দোবদ্ধভাবে যে আকাজ্ক্ষা, অনুভূতি ও আকুতি প্রকাশ করেন সেটাই লোকগীতি। সাধারণভাবে লোকগীতি অর্থ বহুকালব্যাপী জনগণের মধ্যে, জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য স্বতঃপ্রণোদিতভাবে স্বতঃপ্রণোদিত সুরে মুখে মুখে প্রচারিত গান।

মানুষের মন কবি মন। কবি মানুষ, কবিতা রচনা করেন, গান রচনা করেন তার জীবন যন্ত্রণা এবং যুগযন্ত্রণা থেকেই। গানের কথা, গানের মর্মবস্তু তিনি নির্বাচন করেন, বেছে নেন তার পারিপার্শ্বিকতা থেকে, তার চারপাশের সমাজ থেকে। তিনি নিজে সমাজের একজন সদস্য তো বটেই। আমরা আগেই বলেছি, লোকগীতির সমাজ বহুত্ববাচক। অনেক মিলে 'এক'। কজেই সেই যে কবি 'লোককবি' যে নিজেও লোকসমাজের সদস্য, তবু সেই কবি গান রচনা করলেই সেই গানও লোকগীতি অভিধায় ভূষিত হবে না-যতক্ষণ-না ঐ সমাজ গানটিকে তাদের নিজেদের মনের কথা হিসেবে মেনে নিচ্ছে বা গ্রহণ করছে। এখানেই লোকগীতির পরীক্ষা প্রয়োজনে তারা হাতে তুলে নিবে ছুরি-কাচি, কেটে-ছেঁটে বিয়োজন-সংযোজন করে নিজেদের মনের মতো করে সাজিয়ে নিবে। নিজেদের মন মনে কোন মন, ঐ সংহত মন। ঐ সংহত সমাজের মানসভুবনের চাহিদা, অনুভূতি, আশা-আকাঙ্ক্ষার সম্মিলিত রূপ। তারা কি চায়, কি আবার চাইবে ? জীবনতো বাঁচারই জন্য। এখানে ঐ লোকসকল

চায় ভালোভাবে বাঁচতে, সুখ-শান্তিতে, স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচতে। কিন্তু বাঁধা কোথায় ? আছে বাঁধা, বাঁধা আছে বলেই তো' লোকগীতি'। বাধাঁ আছে প্রাকৃতিক পারিপার্শ্বিকতার, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বাঘ-সিংহের মতো হিংস্র-জানোয়ারের, আর আছে সামাজিক পরিপার্শ্বিতার। যার জন্ম 'শ্রেণী সমাজে'। এই 'শ্রেণী সমাজ' জিনিসটা কি? এখানেই 'সমাজতত্ত্বের মূল নিহিত। সমাজতত্ত্ব বলতে পারে শ্রেণী সমাজ কি? এর জন্ম কখন ? কোথায় ? কিভাবে।

আমরা সবাই একবাক্যে বলি আগের দিনের সমাজ ছিল সাম্যের সমাজ, সমবন্টনভিত্তিক সমাজ, তারা যোগড়-যত্ন করত সবাই মিলে, ভোগও করত সবাই মিলে। এই যে আমরা বলি 'আমরা'-এই 'আমরা, কারা? এখানে আমরা বলতে বুঝি সমাজবিজ্ঞানীরা, ভাষাবিজ্ঞানীরা, ইতিহাসবিজ্ঞানীরা, প্রত্ন-বিজ্ঞানীরা। এসব বিজ্ঞানীরা মানুষের জন্মের ইতিহাস, তার বড় হবার ইতিহাস অনেক কষ্ট-শিষ্ট যোগাড়-যত্ন করে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তার হাঁড়ির খবর প্রকাশ করেছেন।

মার্ক্স বলেছেন, "মানুষের ইতিহাস মানেই শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস"। ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে ? শ্রেণী সংগ্রাম সেই সমাজেই হতে পারে যে সমাজ শ্রেণীযুক্ত। শ্রেণীহীন সমাজে তো শ্রেণী সংগ্রামের প্রশ্ন আসে না। অর্থাৎ শ্রেণী সমাজেই নিয়ত সংঘটিত হয় শ্রেণী সংগ্রাম। আর আমাদের লোকগীতি অনিবর্যভাবেই এই শ্রেণী সমাজের, শ্রেণী সংগ্রামের মানসলোক থেকে সৃষ্ট। তাহলে ব্যাপারটি দাঁড়াচ্ছে-মানুষের ইতিহাস মানে যেমন শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহস, তেমনি লোকগীতির ইতিহাস মানে শ্রেণী সমাজের ইতিহাস। অর্থাৎ লোকগীতির ইতিহাস মানুষের ইতিহাসের ন্যায় প্রাচীন।

সমাজ যে এক সময় শ্রেণীবিযুক্ত, শ্রেণীবিযুক্ত, শ্রেণীহীন, সম-অধিকারের এবং সমবন্টনের ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়েছিল এবং তা ছিল হাজার হাজার বছর ধরে, সে সমাজও ছিল প্রগতিশীল, সে সমাজও সভ্যতার পথে ধাপে ধাপে অগ্রবর্তী হয়েছে, বৈদিক সাহিত্য, গ্রিক ও রোমান সাহিত্য তার একটা উজ্জ্বল উদাহরণ।

প্রাগৈতিহাসিক লোকগীতি কিরূপ ছিল তা আমাদের জানা নেই। তবে মানুষ তার আনন্দ-বেদনা-উচ্ছাস ও আবেগ বিভিন্ন ডাক, চিৎকার, শব্দ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যেমে প্রকাশ করত। সেই থেকে দুঃখ, বেদনা, আশা, ভয়, সংশয় প্রভৃতি বিভিন্ন জৈবিক অবস্থা, মনের ভাব ও আবেগ প্রকাশের জন্য প্রথমে সুর বা স্বর পরে কথা বা ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। সে যুগে সব লোকগীতিই মুখে মুখে রচিত ও প্রচারিত হয়ে এসেছে।

লোকসংস্কৃতির বা ফোকলোরে এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারী এই ভারতবর্ষ। তারই দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বিশাল এক ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল বংলা ভাষাভাষী অঞ্চল । নৃতাত্ত্বিক বিবেচনায় দৈহিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব দু'টোরই সমানভাবে উত্তরাধিকারী এই বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল। ভারতবর্ষের মানব বসতির প্রাচীনত্ব প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর -সেই মধ্যে প্লাইস্টোসিন যুগে। সুতরাং সুদূরপ্রসারী ঐতিহ্যের ধারায় সুপ্রাচীন অতীতে লোকসংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ স্বাভাবিক ঘটনা। ভারতের কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সংস্কৃতিতে মৌখিক ঐতিহ্যাশ্রয়ী লোকসংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল স্বতঃস্ফূর্ত ধারায়। ভারতবর্ষের প্রাচীতম গ্রন্থ বেদ মূলত স্মৃতি ও শ্রুতিনির্ভর। এ কারণে বেদের অপর নাম শ্রুতি। বংশ পরম্পরায় মুখে মুখে কথিত শ্লোক কিংবা গান একজন থেকে অপরজন তার স্মৃতিতে ধরে রাখত। স্বভাবতঃই 'বেদ' লোকসাহিত্যর ধারাতেই আবর্তিত হতো। প্রাচীনতম বেদ ঋগ্বেদকে লোকসাহিত্যের আকার গ্রন্থ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ঋগ্বেদের সূক্তগুলোর মধ্যে দেখা যায় লোকগীতির আদিরূপ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এ সমস্ত শ্লোক-গাথার মধ্য দিয়ে সমসাময়িক সমাজ- জীবন, ধর্মীয় চিন্তাচেতনা ও লোকসাধারণের সামগ্রিক জীবনাচরণের এক সুস্পষ্ট চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এও জানা গেছে যে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে এ সমস্ত গাথা বা শ্লোকগুলি গানের সুরে গীত হতো।[৪]

লোকসাহিত্যের প্রাচীন নির্দশনের মধ্যে সমকালীন সমাজ ও জীবনের বিশ্বস্ত প্রতিফলন পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত এমনকি ঋগ্বেদের প্রাচীন সূক্তগুলো বিশ্লেষণ করলে প্রমাণ মেলে যে, এগুলোর রচনাকালে যে সমাজে কাঠামোটি বিদ্যমান ছিল সে সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের পূর্বকালীন সমাজ। সে সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির

অস্তিত্ব ছিল না। সে সমাজে ছিল যৌথ সমাজ বা ট্রাইবাল সমাজ। সে সমাজ ছিল সম-অধিকারের, সমবন্টনের সমাজ। উৎপাদন ছিল মিলিত-যৌথ, তখনকার যৌথজীবন ছিল শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত। যৌথ শ্রম থেকে উৎপন্ন সম্পদও সবাই মিলে ভাগ করে ভোগ করত। এটা ছিল সমাজের আচরিত রীতি বা নীতি। ঋগ্বেদে বারবার 'ভাগ' অংশ এবং সমবন্টনের প্রসঙ্গ উত্থিত হয়েছে। এটি ছিল নীতি বা ন্যায়নীতি, বৈদিক, পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'ঋত'।

দেবতা বরুণ ঋতের দেবতা হিসেবে হয়ে উঠেছিলেন সামাজিক ন্যায়-নীতির প্রতীক। পরবর্তীকালে অনিবার্যভাবেই এ সমাজকাঠামোতে ভাঙ্গবের সূত্রপাত ঘটে। কিন্তু সেই শ্রেণীহীন সমাজের স্বাচ্ছন্দ্য-নির্দ্বন্দ্ব জীবনের সুখস্মৃতি গণমানসে থেকেই যায়-সেই গণমানসের প্রতিনিধি ঋগ্বেদের কবি অপেক্ষাকৃত অবাচীন সূক্তগুলোতে সেই সাম্যমূলক ঋতের কথা, সেই ন্যায়নীতির কথা স্মরণ করেন এবং সেই সমষ্টিচেতনাসম্পন্ন যৌথ জীবনে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। এমনি একজন কবির নাম 'কুৎস'। তিনি বলেন, "দুঃখ-নিবারক অন্ন-কারী বরুণকে আমি বলছি, আমি (এ-কথা) দৃঢ় হৃদয় বলছি-নতুন করে ঋতের জন্ম হোক।" কবির কণ্ঠে ভেসে উঠেছে ঋতহীন সমাজের পরিস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং অতিতের যৌথ জীবনকে ফিরে পাবার আকুতি।[৫]

আদিম সাম্যসমাজের স্মারক বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণই রয়ে গেছে। ঋগ্বেদে যে যজ্ঞে কথা আছে সে যজ্ঞ এক ধরনের যাদুবিশ্বাসমূলক প্রক্রিয়া মাত্র। বৈদিক যুগের আগুন জ্বালিয়ে ঘৃতাহুতি দিয়ে যজ্ঞনামক যে যাদু-বিশ্বাসমূলক অনুষ্ঠান করেছে তাতে অভিব্যক্ত হয়েছে বৃষ্টির কামনা, পশুবৃদ্ধির কামনা, খাদ্য লাভের কামনা, জীবনোপায় সহজ ও সুন্দর হওয়ার কামনা। যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সে কামনা বাস্তব হয়ে উঠবে, এ যাদুবিশ্বাস অপরাপর আদিম সমাজের মতো, বৈদিক সমাজের মতো বৈদিক সমাজের মানুষের মধ্যেও দৃঢ়মূল ছিল। সুতরাং ঋগ্বেদকে আদিম সমাজের লৌকিক কামনামূলক সাহিত্য বলা যায়। অর্থাৎ এ সাহিত্য লৌকিক ঐতিহ্যের অন্তর্গত। প্রাচীন লোকসাহিত্য বিশেষত যখন কাগজ-কলমের মতো লেখ্য প্রযুক্তি সৃষ্টি হয়নি তখন লোকসাহিত্য গণমানুষের মুখে মুখে রচিত ও লোকপরম্পরায় শ্রুতিতে সংরক্ষিত হতো।[৬]

মানুষ সামাজিক জীব। মানুষের মনে সামাজিকতার চেতনা কিভাবে উন্মেষ হলো, কথার উত্তরে আমারা সহজ করে কলতে পারি যে, মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনা জাগ্রত হয়েছে আত্মরক্ষার তাগিদে। সে যখন প্রাকৃতিক ঝড়ঝঞ্ঝা, রোদ-বৃষ্টি-বন্যায় আক্রান্ত, বন্য পশুর দ্বারা আক্রান্ত তখন বাঁচার তাগিদে একে অপরের কাছাকাছি এসেছে-সে দেখেছে সবার মিলিত -শক্তিই তাদের বাঁচাতে পারে। এভাবে যূথবদ্ধ সমাজের সূত্রপাত ঘটে। যূথবদ্ধ হবার আর একটি মখ্য কারণ তার উদারপূর্তি। ফলমূল সংগ্রহ করে বা ছোট ছোট জীবজন্তু মেরে তার খাদ্যচাহিদা মিটছে না ; তার চাই বড় বড় পশুর মাংস। একদিকে হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জোর তাগিদ, অপরদিকে পেটের জ্বালা মিটাতে ঐসব বড় বড় পশু শিকার তাগিদ। সংঘবদ্ধভাবে খাদ্য আহরণ, পশু শিকার, পশু পালন থেকে সামাজিক চেতনার নতুন মাত্রাযুক্ত হয়। সমাজবিজ্ঞানী দুর্খাইম এ অবস্থাকে বলেছেন গোষ্ঠীচেতনা (Group consciousness)। বস্তুত সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের মানসিকতা থেকে গোষ্ঠীসচেতনতার জন্ম। কিন্তু এই যে সবাই মিলে উপার্জন, বন্টন ও ভোগের জন্য সৃষ্ট যুথবদ্ধজীবন এর মধ্যে কালক্রমে দেখা দেয় ব্যক্তি- চেতনা, ব্যক্তির আধিপত্য বিস্তারের মানস-প্রবণতা। এটি অঙকুরিত হয় ঐ গোষ্ঠীচেতনারই সূতিকাঘরে। সমাজ ধাবিত হয় পরিবর্তনের পথে। সম-বন্টনভিত্তিক (Equal-distrbution) সমাজের ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রচলিত যূথবদ্ধতা থেকে সৃষ্ট শক্তি বা সামর্থ্য যেটা সংগঠিত হয়েছিল প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও হিংস্র জীবজন্তুর হাত থেকে মানুষের বাঁচার তাগিদে; তখন থেকে সেটা ব্যক্তি তার আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, একদল আর একদলকে পরাস্ত করে তাদের যা কিছু সম্বল তা লুণ্ঠন করে। ফলে ইতিহাসে এক বর্বর সমাজের সূচনা ঘটে এবং অঙকুরিত হয় শ্রেণীসমাজ। গোষ্ঠী সচেতনতার মানসিকতাই শ্রেণী-সচেতনতার জন্ম দেয়। সামাজিক কাঠামো এমন এক স্তরবিন্যাসের সূচনা করে যে, ব্যক্তি অস্তিত্ব সমাজ ও শ্রেণী নিরপেক্ষ হতে পারে না আর্থাৎ শ্রেণীকাঠামো এক শক্ত ভিত তৈরী করে। ফলে কালক্রমে শ্রেণী সংঘাত অনিবার্য

হয়ে ওঠে। শ্রেণীসমাজ থেকে শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং শ্রেণীসংঘাত সমাজকে এক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়-সম-বন্টনভিত্তিক সেই সমাজের সরল জীবন, সংঘাতহীন সমাজই পুনরায় কামনা করেন ঋগ্বেদের কবি কুৎস। শ্রেণী-সমাজের যে কুফল, আশান্তি তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন শান্তির প্রতীক, বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। লুণ্ঠনমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে সাম্য-ন্যায়ের যে ঋত হারিয়ে আনার জন্য জনগণের আর্তিই কবি কুৎস প্রণীত সূক্তে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। এ ধরনের সংকটাপূর্ণ শ্রেণীসংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়ের উদ্ভব ঘটে বৌদ্ধ মতবাদে। গৌতম বুদ্ধ বর্ণাশ্রমের কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে যে বলিষ্ঠ মতাদর্শ প্রচার করেছিলেন, তার মূল তো নিহিত ছিল আদিম সাম্যবাদী সমাজের ঐতিহ্যের মধ্যেই। রাহুল সাংকৃত্যায়ন মূল বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, বুদ্ধ ছিলেন সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারের বিরোধী, সম্পদের সামাজিক সালিকানাই ছিল তাঁর আদর্শ আধুনিক কালের সমাজতন্ত্রীদের মতো বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন যে মানব সমাজের আদি যুগে সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা ছিলনা। ভিক্ষুসংঘের জন্য তিনি নিয়ম করেছিলেন যে, কোনো ভিক্ষু যদি জ্ঞাতসারে সংঘের লাভকে ব্যক্তিগত লাভে পরিণত করে, তবে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বুদ্ধ কেবল ৮টি জিনিসকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহারের অধিকার ভিক্ষুদের দিয়েছিলেন-যেমন মাটির তৈরী একটি ভিক্ষা পাত্র, তিনটি পরিধেয় বস্ত্র, একটি সূচ, একটি ক্ষুর, একটি কটিবন্ধ ও একটি জলপাত্র ।[৮]

লোকগীতি লোকসাহিত্যের অন্যতম শাখা। আর লোকগীতি দেশে-কল নির্বিশেষে সমাজের গীতময় জীবনচিত্র। তাতে চিত্রিত হয় সমাজের প্রতিচ্ছায়া। যেকোনো দেশের দেশের লোকগীতি উন্মোচন করে সমাজবিজ্ঞানের বিচিত্র অধ্যায়। সমাজবিজ্ঞানীর দায়িত্ব সমাজ কাঠামোর মূল্যায়ন, সমাজের বিকাশ, বিবর্তন ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশ্লেষণ। সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার বিকাশে ইউরোপের শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) সমাজ বিবর্তনে নতুন মাত্রা যুক্ত করে এবং এ বিপ্লবের পটভূমি, তার ফলাফল সমাজবিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সের সমাজজীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব আনে। সাঁ সিনে, কোঁৎ, তকভিল প্রমুখের মধ্যে বিপ্লবোত্তর ফরাসি সমাজে সমাজতাত্ত্বিক কল্পনার বিকাশ ঘটে। ফলে পুরানো সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তন ঘটে-প্রবর্তিত হয় নতুন পুঁজিবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র। পুরানো ধ্যান-ধারণা ঝেড়ে ফেলে নতুন ধ্যান-ধারণার জন্ম হয়-গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবিকতার চেতনা বৃদ্ধি পায়-পরিবার, রাজনীতি, শিক্ষা, সম্পত্তি-সম্পর্ক, বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, ভৃত্য ও তার পালনকর্তা, ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সম্প্রদায়, মর্যাদা, কর্তৃত্ব, মতাদর্শ, সবক্ষেত্রেই দ্রুত রদবদল ঘটতে থাকে। ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে বিমুক্ত করা হয়; এটা যুক্তিগ্রাহ্যভাবেই করা হয় যে, ধর্ম ব্যক্তির নিজস্ব পরিসীমার মধ্যেই ব্যাপ্ত থাকবে। যুক্তিতর্কের মানদণ্ডে সমস্ত ঘটনা ও বিষয়কে ব্যাখা করার প্রবণতা দেখা দেয়। যে চেতনা থেকে এ অনুধাবন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং সম্প্রদায় ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সমমর্যাদার এক মানবতাবাদী আবহ সৃষ্টির যে প্রেরণা অঙ্কুরিত হয় সেই চেতনাকে পিটার বার্জার বলেছেন, "সমাজতাত্ত্বিক চেতনা"। কোঁৎ থেকে দুর্খাইম পর্যন্ত সব সমাজতাত্ত্বিকের রচনার প্রেক্ষাপটটি ছিল ফরাসি বিপ্লব। এ বিপ্লবের মর্মবাণী ছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। মৈত্রী মানে মিত্রতা ; বন্ধুত্ব-মানুষ সবাই একে অপরের বন্ধুভাবাপন্ন, যা জাতিতাত্ত্বিক দিক থেকে মানবজাতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে মর্গান কথিত সমাজের তিনটি স্তরের (বন্য-বর্বর-সভ্য) মধ্যস্তর, যে সমাজের প্রবণতাই ছিল শত্রুভাবাপন্ন, সর্বদাই একে অপরের শত্রু-ফরাসি বিপ্লবের মৈত্রী চেতনা সমাজকে সে অবস্থা থেকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ উল্টো পথে ধাবিত করে, সমাজজীবনে এই প্রতিতী জন্মে যে, মানুষ একে অপরের শত্রু নয়-বন্ধু। দ্বিতীয়টি হচ্ছে 'সাম্যবোধ,। "বড় সে যেমনি হোক"; চণ্ডীদাস কথিত "সবার উপরে মানুষ সত্য"। মানুষের প্রতি মর্যাদা বোধের প্রাচ্যের এই আহ্বানেরই প্রতিধ্বনি ফরাসি বিপ্লবের সাম্য চেতনা; প্রতিটি মানুষের মর্যাদাকে স্বীকার করা, যেন মানবহিতৈষণার এক অনন্য দিকচিহ্ন 'সাম্য','সাম্য-মৈত্রী–স্বাধীনতা'। শেষোক্তটি এই 'স্বাধীনতা'-প্রতিটি মানুষই স্বাধীন, সে না বন্দি সমাজের কাছে না ধর্ম বা রাষ্ট্রের কাছে। ফরাসি বিপ্লবে ব্যক্তির যেকোনো বৃত্তি অর্জনের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। এ বিপ্লবের মর্মবাণী ছিল ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী চেতনায় বাক্তির যেকোনা বৃত্তি অর্জনের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়। এ বিপ্লবের মর্মবানী ছিল ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তিবাদী চেতনায় ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বাধীনতাকে স্বীকার করা যা পূর্ববর্তী সমাজে ছিল গ্রাহ্যসীমার বাইরে। সমজতত্ত্ব বিকাশের প্রায় ঊষালগ্নেই কিছু কিছু মৌলিক প্রশ্নে সমাজবিজ্ঞানীরা দ্বিধাবিভক্ত

হয়ে যান। এক. ধ্রুপদী সমাজতত্ত্ব, যার অন্যতমতাত্ত্বিক ভিত্তি 'ভিত্তি দৃষ্টিবাদ', এবং মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব, যার ভিত্তিভূমি হলো 'দ্বন্দ্বতত্ত্ব'। দৃষ্টিবাদীরা সমাজকে নিরীক্ষণ করেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে, তারা সমাজের বিশৃংখলা, বেকারত্ব, দারিদ্র সমস্যা সব কিছুর সমাধানসুত্রে এক সমঝোতা স্মারক উপস্থাপন করেন ; অনেকটা যে কারনে সমস্যার সূচনা সমাধান তাদেরই আনুকূলে। পরবর্তিকালে দৃষ্টিবাদীরা কাঠামোবাদি রূপ পরিগ্রহ করে। কাঠামোবাদ হলো ইতিহাস-নিরপেক্ষ সমাজবীক্ষণ যা অতীত ও ভবিষ্যৎ থেকে বিচ্ছিন্ন, কেবল বর্তমানের মধ্যে নিবদ্ধ। অর্থাৎ তাঁরাও সমাজ ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে আগ্রহী, তবে বর্তমান সমাজ কাঠামোর আঁকার ধরে তারই সংস্কার সাধন-অর্থাৎ তারা নতুনভাবে সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধী। অপরপক্ষে মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব বা দ্বন্দ্ব সমাজ ব্যবস্থাকে একটা প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করে। এ তত্ত্বের মর্মকথা হচ্ছে বর্তমান প্রচলিত সমাজ শৃংখলার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য। মার্ক্স ও এঙ্গেলস-এর যৌথ প্রণীত ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত কমিউনিস্ট ইশতেহারের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম বাক্যই হলো "আজ পর্যন্ত বদ্যমান সমস্ত সমাজের ইতিহাস হলো শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস"। মার্ক্স-এঙ্গেলস- এর চোখে 'শ্রেণী' হচ্ছে মৌলিক সামাজিক গোষ্ঠী ; যার সংঘাতে সমাজের বিকাশ ঘটে। মার্ক্স কথিত পূর্ববর্তী তিনটি স্তর 'আদিম সাম্যবাদী সমাজ', 'দাস সমাজ' এবং 'সামন্ত সমাজ' শ্রেণীসংঘাতের প্রক্রিয়ায়ই পরিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং শ্রেণীসংগ্রামের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজের রূপান্তর সাধন সময়ের ব্যাপার। মার্ক্সীয় চিন্তায় উপাদানগুলির সমন্বিত রূপ হলো ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ; আর তার সমাজতত্ত্বের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি হলো দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো 'উৎপাদন'। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের যথোপযুক্ত মিলনে ওঠে উৎপাদন পদ্ধতি। উৎপাদনের হাতিয়ার হচ্ছে উৎপাদিকা শক্তি; আর উৎপাদন সম্পর্ক বলতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত বিভিন্ন মানুষের সম্পর্ক বুঝায়। উৎপাদন পদ্ধতি হলো সমাজীবনের ভিত্তি। আর এই উৎপাদন পদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করে সংস্কৃতি, মতাদর্শ সর্বোপরি রাষ্ট্র। মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হচ্ছে 'শ্রেণী সংগ্রাম'। শ্রেণী সংগ্রাম মুলত শোষণমূলক । সমাজ কাঠামোর পরিবর্তন সাধনে শ্রেণী সংগ্রামের ভূমিকাই মুখ্য। সমাজের প্রতিটি স্তরের অভ্যন্তরস্থ দ্বন্দ্ব স্তরে উত্তীর্ণ হতে সাহায্য করে। আমরা দেখতে পাবো লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকরণের মধ্যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ সর্বদাই ক্রিয়াশীল। অর্থাৎ আমরা যে লোকগীতির সমাজতত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি এই লোকগীতি প্রণীত হয়েছে সমাজে প্রবর্তিত শ্রেণীদ্বন্দ্বের আধাররূপে। সমাজ ব্যবস্থা, তার পরিবেশে- পরিমন্ডল, তার সংকট-সংঘাতেরই বহিঃরূপ প্রকটিত হয়েছে লোকগীতির বিষয়বস্তুতে। লোকগীতির বক্তব্যে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-বেদনা, জনগণের প্রাণের স্ফুরণ তার মর্মবানীতে চিত্রিত হয়েছে বলেই তো সে লোকগীতি। জনগণ যতক্ষণ না এটা করছে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো গানই লোকগান নয়। আর জনগণ তাই গ্রহণ করবে, যার মর্মবাণীতে থাকবে তার আকাঙ্ক্ষার স্ফূরণ, তার প্রাণে স্পর্শ, যাতে সে অনুভব করে প্রাণের স্পন্দন।

আমাদের প্রাচীন রসবাদী আলংকারিকগণ পর্যন্ত বলেছিলেন যে, লৌকিক জগতের কাছে সুকুমার কলার কোনো দায় নেই। শুধু প্রাচীন নয় পরবর্তীকালে এবং আধুনিক যুগের যারা কলাকৈবল্যবাদী তারাও এ মতেরই পরি পোষক। শিল্পের অলৌকিকত্বের থিয়োরি কিংবা "aart for arts sake" বা "শিল্পের জন্য শিল্প", এই থিয়োরি মানুষের কর্ম ও সংগ্রামমুখর সমাজ থেকে সঙ্গীতকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়। এ মতের বিরুদ্ধে অচিরেই পন্ডিতগণ বিগত শতকগুলোতে বহু যুক্তির অবতারণা করেন। আজকের দিনে শিল্পজগতে বিশুদ্ধ কলাকৈবল্যবাদী খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। একালে প্রায় সকল পন্ডিতই একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সঙ্গীত তথা যেকোন শিল্পই সমাজ থেকে উদ্ভুত। বস্তুজগত এবং মানব সমাজই সঙ্গীতের উৎস। কিন্তু একথা স্বীকার করার পরেও তারা এক জায়গায় এসে পুরাতন কলাকৈবল্যবাদীদের মতোই বলতে চান যে, সামাজিক সংগ্রামগুলোর ক্ষেত্রে সঙ্গীতের কোন ভূমিকা নেই। এ প্রসঙ্গে বিপ্লবী সঙ্গীতকার কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তার "গীতসূত্রসার"-শীর্ষক গ্রন্থে সঙ্গীতের উৎস সম্পর্কে বলেছেন- "অনেকে বলেন সঙ্গীতের উদ্দেশ্য কেবল আমোদ-প্রমোদ। এ কথা নিতান্ত অপবিত্র ও অবাচ্য।...যে সঙ্গীতের অন্য উদ্দেশ্য নাই তাহা অবশ্যই অপদার্থ এবং অশ্রদ্ধেয়।"[৯] যুগে যুগে সঙ্গীত তথা শিল্পকর্মে সমকালীন সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত প্রকাশিত হয়েছে। কোনো যুগের সাংস্কৃতিক মান

নির্ধারিত হয় বৈষয়িক উৎপাদন বিকাশের মাত্রা অনুযায়ী। শিল্প-সাহিত্যেও প্রস্ফুটিত হয় সমাজের বস্তুভিত্তি, উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তিতে গঠিত সমাজকাঠামো, এরই ভিত্তিতে চলমান শ্রেণীদ্বন্দ্ব, মতাদর্শিক দ্বন্দ্ব। প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগেরই শিল্পকর্মে সে যুগের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। যে সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণীদ্বন্দ্ব বিদ্যমান, তার শিল্প-সাহিত্য শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটবেই; সে শিল্প-সাহিত্য কখনো কখনো যে বিশেষ একটি শ্রেণীর রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দাসযুগ, সামন্ত বা মধ্যযুগীয় কাল থেকে আজ পর্যন্ত শিল্পকর্মের ধারাবাহিক পর্যালোচনা করলে তা থেকে সামাজিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে সঙ্গীতের সামাজিক দায়বদ্ধতা বা গণচেতনার রূপটি প্রকাশিত হবে।

সামন্ত সমাজে পরিশীলিত বা ধ্রুপদী সঙ্গীতের বিকাশ ঘটেছিল এবং তা সমাজের উচ্চশ্রেণী, সামন্তপ্রভু ও শাসকদের চিত্তবিনোদনের উপাদান হিসেবেই গৃহীত হয়েছিল। সামন্ত সমাজে সাধারণভাবে শিল্পকর্ম, তথা সঙ্গীতের সামাজিক উদ্দেশ্য ছিল সমাজের এক ক্ষুদ্রতম সুবিধাভোগী অংশের মনোরঞ্জন ও সন্তুষ্টিকরণ আর বৃহত্তম শোষিতশ্রেণীকে নিজ ভাগ্যের প্রতি, ঈশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ হওয়ার নীতি শিক্ষাদান। ধ্রুপদী সঙ্গীতের নান্দনিক উপভোগ প্রবণতা এবং সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম রূপ প্রকশের মধ্যে দিয়ে সঙ্গীত ক্রমশই বিমূর্ত রূপ ধারণ করে। ফলে ধ্রুপদী সঙ্গীত জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যুগ যুগ ধরে প্রবহমান জনঘনিষ্ঠ সঙ্গীত লোকগীতির প্রবণতা নান্দনিকতার চেয়ে লোকায়ত বা লোকসমাজের আর্থ-সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিই অধিক গুরুত্ব দেয়। ধ্রুপদী সঙ্গীতের মর্মবাণীতে রয়েছে জগত ও জীবনের নিয়ন্ত্রক মানুষ নয় ঈশ্বর বা কোনো অতিন্দ্রীয় শক্তি।[১০] আর সামন্তপ্রভু এবং অভিজাত সম্প্রদায়ই হচ্ছে তার প্রতিনিধি। সমাজের বৃহত্তম অংশের জীবনের নিবিড়তম সম্পর্ক হচ্ছে লোকগীতির সাথে। সমাজের বৃহত্তম অংশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা, তাদের নিপীড়ন- নির্যাতনের চিত্র, সামাজিক নানা-বাধা-বিপত্তি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ইত্যাদি বাস্তব অভিব্যক্তির প্রতিফলন ঘটে লোকগীতি জনজীবনের সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও সংবেদনশীল রূপ। লোকগীতির বিষয়বস্তু চিত্রায়িত হয় জনজীবনের বাস্তবানুগ চিত্র।

আমরা দেখি, সামন্ততান্ত্রিক সমাজে সঙ্গীতের যেটুকু সামাজিক ও গণভিত্তি অবশিষ্ট ছিল বুর্জোয়া সমাজে তা সম্পূর্ণ পাল্টে যায়; সঙ্গীতের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম এবং উপভোগের জগতকে সম্পূর্ণভাবে পাল্টে দিয়ে সঙ্গীতের সবকিছুকেই তারা পণ্যে পরিণত করে। অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর ন্যায় সঙ্গীতও হয় পণ্য এবং সঙ্গীতকে পরিণত করা হয় নিছক অবসর-বিনোদন ও আনন্দ-উপভোগের বস্তুতে। সঙ্গীতে অনুপ্রবেশ ঘটানো হয় সস্তা চটুলতা এবং উত্তেজনা উপাদান যা-কিনা আবেগনির্ভর এবং জীবন-সংগ্রামের প্রতিফলন। জীবনের মূল আরাধ্য কেবল মুনাফা এ নীতিতে সঙ্গীতের বিকৃতি সাধন ও অবদমন ঘটে, আর বুর্জোয়া সমাজে একজন শিল্পী হন ব্যক্তিগতভাবে মজুরিভূক্ত কর্মচারী মাত্র।[১১]

বুর্জোয়ারা মুনাফার আশায় সুস্থ উচ্চামানের সঙ্গীতের পরিবর্তে কুরুচিপূর্ণ নিম্নমানের অবক্ষয়ী সঙ্গীতের মাধ্যমে এবং সমাজ অধঃ পতনের দিকে ঠেলে দেয়। অথচ এ বুর্জোয়ারাই যখন সামন্তবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেছিল। এবং 'সাম্য -মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে সামন্ত সমাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠন করে উপর্যুপুরি বিজয় অর্জন করেছিল, তখন এ সংগ্রামে সঙ্গীতের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবে, অবক্ষয়ী ও ঘুণেধরা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে সঙ্গীতের বাণী ও সুর সংগ্রামমুখী মানুষকে বিপ্লবে উজ্জীবিত করে এবং তাদেরকে একের পর এক উচ্চতর সংগ্রামের দিকে ঠেলে দেয়। আজকের সঙ্গীত পৃথিবীতে দাসযুগ, সামন্তযুগ এবং বুর্জোয়াযুগ এদের অস্তিমত্তা ও মুমূর্ষ অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছে, সমাজতন্ত্রেরও ব্যর্থরূপ সে প্রত্যক্ষ করেছে। সমাজতন্ত্রের এক সফল রূপের প্রত্যাশায় সে প্রহর গুণছে। যুগ যুগ ধরে পৃথিবীব্যাপী কৃষক, শ্রমজীবী ও মেহেনতি মানুষ হাজারো আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত হাজার হাজার সঙ্গীত রচনা করেছেন; যে সঙ্গীত মুলতই লোকগীতি। লোকগীতির সংগ্রামী মননশীলতার সঙ্গে গণচেতনার প্রকাশ ঘেচেছে সর্বকালেই। লোককবিরা এই গণচেতনাকে উজ্জীবিত করেছেন লোকগীতির বাণী, সুর ও বিষয়বস্তুতে ।[১২]

বস্তুত লোকগীতির সংজ্ঞার্থে আমরা এ কথা মেনে নিয়েছি যে, লোকগীতি যে কোনো লোকগোষ্ঠীর, লোকসমাজের, বিশেষত গ্রামীণ সমাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত লোকসমাজ কর্তৃক স্বতঃস্বীকৃত এভং গৃহীত সাধারণত যৌথ কণ্ঠে (একক কণ্ঠেও হতে পারে) গীত হয়; যা সাধারণভাবে অলিখিতরূপে সৃষ্টি হয়; যা পুরুষানুক্রমিক, ঐতিহ্যিক ও ট্র্যাডিশনাল ধারায় প্রবহমান থাকে; যা সাধারণতই সচেতন শিল্পসৃষ্টির, অন্তর্গত নয়; যা বিষয়বস্তু এবং ভাষাগতভাবে লোকসমাজের বিশেষত গ্রামীণ শ্রমজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের আত্মসম্পদ; যার রয়েছে আঞ্চলিক সুর ও ধ্বনি কাঠামো; যা সাধারনত শিক্ষা নির্ভর নয়-যা আঞ্চলিকভাবে জনসাধারণের কণ্ঠে আপনি ধ্বনিত হয়; যা লোকসমাজের প্রাণস্পর্শী; যা সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের সমস্ত মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করে, অনুপ্রাণিত করে।

লোকগীতি সংহতি চেতনার বহিঃপ্রকাশ। কোনো সংহত সমাজে তার সামাজিক প্রেরণায়, স্বতঃপ্রণোদিতভাবে কবি জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে রচনা করেন লোকগীতি। লোকগীতি সৃষ্টির প্রক্রিয়াটি সেই সমাজেই উদ্গত হয় যে সমাজের ধারণা বহুত্ববাচক এবং যে সমাজের প্রকৃত পরিচয় তার সামগ্রিকতায়। এখানে সামগ্রিকতাটা হচ্ছে সম্মিলিত মননের সৃষ্টিশীলতা। এর বিষয়বস্তুতে সংস্কৃতি ও মতাদর্শের দ্বন্দ্ব, শ্রেণীদ্বন্দ্ব, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, প্রেম-বিরহ, কর্মপ্রেরণা, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, ধর্ম-অধর্ম সমস্ত কিছুর সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়।[১৩]

আদিম সমাজে মানুষের জীবন সংগ্রামে দৈহিক শ্রমই ছিল তার বড় সম্বল। এই শ্রমের অনুষঙ্গী হিসেবেই পালাক্রমে সৃষ্টি হয়েছিল ভাষার, সুর বা স্বরের এবং সঙ্গীতের। অতএব দৈহিক শ্রমে নিযুক্ত খাদ্যান্বেষী মানুষই একদিন বাঁচার স্বার্থে সৃষ্টি করেছিল লোকসমাজ, সংঘবদ্ধ সংহত যুথবদ্ধ সমাজ। আর এই সংঘবদ্ধ, সংহত, বহুত্ববাচক সমাজেই লোকগীতি অঙ্কুরিত হয়, উদগত হয়, কালক্রমে তা সমাজের সামগ্রিকতার সূত্রে সমন্বিত চেতনার রূপ নেয় এবং বিকশিত হয়।

সমাজের নিয়ম-নীতি ও শৃংখলা বীক্ষণই সমাজতত্ত্ব। বর্তমান নিবন্ধে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লোকগীতি। এই লোকগীতি লোকসাহিত্যের এক অন্যতম শাখা। সমাজেরই রূপ-রস-গন্ধ শৈল্পিকরূপে ভাষাবদ্ধ হয় সাহিত্যে। অর্থাৎ সাহিত্য সমাজের দর্পণ। লোকগীতির বিষয়বস্তুতেও চিত্রিত হয় সমাজের ভাঙ্গাগড়া, বিপদ-বিষম্বাদ, শ্রেণীসংঘাত, তার অন্তর্বিরোধ-দ্বান্দিকতা। সমাজ সম্পর্কিত এসব বিষয়ই সমাজতাত্ত্বিককে সঙ্গীতের গবেষণার দিকে আকৃষ্ট করে-যেহেতু তার কাজ সমাজবীক্ষণ সেহেতু লোকগীতি সমাজনিঃসৃত তাই সমাজতাত্ত্বিকের কাছে এ মুখ্য উপাদান। সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে স্বীকৃত-তার উদ্দেশ্য হলো সমাজ-বাস্তবতার সাথে সঙ্গীতের গতিশীল সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা। প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ও সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ থিয়োডোর অ্যাডোর্না'র অনুসরণে উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদনের পারস্পারিক অবস্থা সম্পর্কের ভিত্তিতে সঙ্গীতের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যায়। এখানে উৎপাদন শক্তি বলতে সঙ্গীত রচনা, উপস্থাপনার সময়ে শিল্পীর পুনঃসৃষ্টির কাজ ও যন্ত্রমাধ্যেমে সঙ্গীত পরিবেশনে বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণকে বোঝায়। আর উৎপাদনে পারস্পরিক অবস্থা হলো অর্থনৈতিক ও আদর্শগত শর্তাবলী, যার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ও তার প্রতিক্রিয়া। শ্রোতার রুচি ও সঙ্গীতমনস্কতাও এর অন্তর্ভূক্ত। সঙ্গীতের উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সম্পর্কে কেবল বিরোধত্মক নয়; বরং উভয়ের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার সম্পর্ক।[১৪]

এখানে দুটো বিষয় আমরা পাচ্ছি-এক. উৎপাদন শক্তি, অর্থাৎ শিল্পী বা কবির পারঙগমতা ; যেমন সঙ্গীত রচনা, উপস্থাপনা, উপস্থাপনকালে, পুনঃসৃষ্টি অর্থাৎ পরিবেশনকালে এর সংযোজন-বিয়োজন, এবং বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণ। দুই আর্থ-সামাজিক অবস্থা, সংস্কৃতি, মতাদর্শ, শিল্পীর জীবনচেতনার যার প্রেরণা ঐ সমাজ পারিপার্শ্বিক, পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল এবং ভৌগোলিক অবস্থা যার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ধ্বনি কাঠামো। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শ্রোতাসাধারণের চাহিদা, সঙ্গীতপ্রিয়তা-শ্রোতাসাধারণ কি সঙ্গীত শুনতে আগ্রহী? তাহলে কোন সঙ্গীতের বক্তব্যে কি থাকতে হবে, কি তাদের বাঞ্ছনা।

উৎপাদন ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বাস্তব জীবনযাত্রা। এটাই সমাজ ইতিহাসের বাস্তবতা। সঙ্গীতের মধ্যে ক্রিয়াশীল-একটি হচ্ছে জীবন সংগ্রামের বাস্তবতা অপরটি হচ্ছে মানসিকতা, তার চিত্তের আবেদন, যাকে আমরা বিনোদন বা নান্দনিকতা বলে থাকি-এ দুটি ব্যাপার পাশাপাশি দন্ডায়মান। স্বতঃস্ফূর্ততা সঙ্গীতের দিক, এ দুইয়ের মিথস্ক্রিয়াই সঙ্গীত তার আসন করে নেয়। সম্ভবত এ কারণে একজাতীয় লোকগীতির মধ্যে পদচারণা ও পরিবেশনরীতির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। কোনো লোকসমাজে বা কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলে সঙ্গীত একটা আদর্শগত রূপ পায় যখন পারিপার্শ্বিকতা প্রাধান্য বিস্তার করে উৎপাদন শক্তির উপর। অর্থাৎ অনুকূল পারিপার্শ্বিকতা শিল্পীকে অনুপ্রাণিত করে। সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব যখন সঙ্গীতের আদর্শগত মর্মবস্তু নিয়ে বিচার-বিবেচনা করে তখন তা সমাজের Ideological Critique -এ পরিণত হয়। উদাহরণস্বরূপ বাউল গানের কথা উল্লেখ করা যায়।[১৫]

সমাজের বাস্তব পরিবেশ সঙ্গীতের বিশেষত লোকগীতির প্রধান উপজীব্য। সমাজ-বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি সঙ্গীত। সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব, সমাজের উপর সঙ্গীতের প্রভাব, সঙ্গীতে গতিশীল সম্পর্ক বিশ্লেষণ-সমাজ কাঠামোয় যা কিছু জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বিশ্লেষণ করা। সমাজতত্ত্বের আলোকে কোনো, লোকগীতিকে ব্যাখ্যা করতে গেলে সংশ্লিষ্ট সমাজে কাঠামো ও পরিবেশকে বিচারেরআওতায় নিয়ে আসতে হবে; কারণ এর দ্বারাই সঙ্গীত রচয়িতার সৃষ্টি ও গায়কের পুনঃসৃষ্টি প্রভাবিত হয়। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট গোষ্ঠীর প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ও সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ থিয়োডার অ্যাডোর্না-র বিশ্লেষণের সাহায্য নিয়ে সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব আলোচনার সূত্রপাত করা হয়। তার মতে, উৎপাদন শক্তি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার (circumstance) পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে সঙ্গীতের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এখানে উৎপাদন শক্তি বলতে কেবল সঙ্গীত রচনা নয়, উপস্থাপনার সময় শিল্পীর পুনঃসৃষ্টির কাজ ও যন্ত্রমাধ্যমে সঙ্গীত পরিবেশনে বিভিন্ন পদ্ধতির সংমিশ্রণকেও বোঝায়। আর উৎপাদনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হলো অর্থনীতিকে ও আদর্শগত শর্তাবলী, যার সাথে যুক্ত রয়েছে প্রতিটি ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য ও তার প্রতিক্রিয়া। আবার শ্রোতার রুচি এবং সঙ্গীতমনস্কতাও এর অন্তর্ভূক্ত এবং তার বিশ্লেষণ ও সঙ্গীতের সমাজতত্ত্বের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উৎপাদনের পারিপার্শ্বিক আস্থার সম্পর্ক কেবল বিরোধাত্মক নয়, বরং উভযের মধ্যে রয়েছে পারস্পরিক লেনদেনের সম্পর্ক। সঙ্গীতের বিশেষ সামাজিক ক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তি পরিবর্তন করতে পারে উৎপাদনের পারিপার্শ্বিকতার, এমনকি সৃষ্টিও করতে পারে, যেমন উচ্চস্তরের সঙ্গীত সৃষ্টি জনরুচির পরিবর্তন করতে সক্ষম। তবে জনরুচির পরিবর্তন কতটা এবং কীভাবে উৎপাদনের পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল, অথবা উভয়েই 'সময়ের পরিবর্তনশীল ভাবধারা'র (Changing spirit of the time) ওপর সমানভাবে নির্ভরশীল কিনা, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকতে পারে। অন্যদিকে আবার দেখা যায় যে, উৎপাদনের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও শৃঙ্খলিত করতে পারে উৎপাদন শক্তিকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমানে বাজারী চাহিদার চাপে প্রগতিশীল সঙ্গীতের মূল্য হ্রাস পাচ্ছে তার স্বতঃস্ফূর্ততা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে সঙ্গীতের সমাজতত্ত্ব 'যা গড়ে উঠেছে ও গৃহীত হচ্ছে' (What comes to be and is consume) তা নিয়েই শুধু আলোচনা করে না, বরং যা গড়ে উঠতে পারে না এবং হারিয়ে যায় (What does not to be and is scuttled) তা নেয়েও আলোচনা করে। বাংলা লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এমন অনেক প্রতিবাদী সঙ্গীতের সন্ধান পাওয়া যায়, যা সমাদৃত হয়েছে। অন্যদিকে সামাজিক অনুশাসন ও অত্যাচার অনেক গায়কের কণ্ঠ রুদ্ধ করে দিয়েছে। এখানে বাউলবিরোধী আন্দোলনের উল্লেখ করা যায়। অতি সাম্প্রতিককালেও নদীয়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলাতে ধর্মীয় মৌলবাদীরা বাউল-ফকিরদের জীবনাচরণ ও গানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।[১৬]

বাঙলা লোকগীতি হিসেবে পরিচিত প্রায় ছয়-সাত শত প্রকৃতির যেসব গান রয়েছে তার সিংহভাগই গড়ে উঠেছে অভিবক্ত অর্থাৎ বৃহৎ বাঙলার কৃষিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক সমাজ থেকে। যেমন, "আয় আয় ধান কাটিতে যাই/ ধান কাটিয়া মোটা বান্ধিয়া বাড়ি লইয়া যাই" এবং "রঙ্গের বৈঠা রঙ্গে বাইও/লখিন্দরের নাগাল পাইলে আরং দিতে কইও গো।" দুটো গানই সমবেত কণ্ঠের গান কিন্তু তদের ভাব, সুরের চলন, গায়নভঙ্গি এবং পরিপ্রেক্ষিত

পৃথক। প্রথম গানে দৈনন্দিন দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও ফসল তোলার আনন্দ, অন্তত সাময়িক স্বাচ্ছন্দ্যের আশ্বাস, আর দ্বিতীয় গানটি পূর্ববাঙলার (অধুনা বাংলাদেশের) নৌকাবাইচ খেলার গান, যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভাবই প্রধান। কাঁসর-ঘন্টার তালে এ জাতীয় গান গীত হয়, না হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব ফুটিয়ে তোলা যায় না ।

পল্লীকবি হিসেবে খ্যাত কবি জসীম উদদীন (১৯০৩-১৯৭৬) তার বিভিন্ন রচনায় জীবনের কৃষকের গার্হস্থ্য জীবনের নিখুঁত চিত্র অংকন করেছেন। স্ত্রীহারা এক বাঙালি বৃদ্ধের মনোজগতের আকুতি এবং বৃদ্ধার দাম্পত্যজীবনের ভালবাসার স্মৃতিচার 'কবর' কবিতায় এক অনন্য কাব্যিক ব্যঞ্জনায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। আমরা এরই সঙ্গে স্মরণ করতে পারি লোকগীতির সুগায়ক আব্বাসউদ্দীন আহমেদ (১৯০১-১৯৫৮) -এর কণ্ঠে গীত "ও বাজান চল যাই মাঠে লাঙ্গল বাইতে" গানটির কথা। গ্রামীণ মানুষের, দরিদ্র কৃষকের অন্তর্বেদনার কথামালার জনপ্রিয় এ গানটি রচনা করেছেন কবি জসীম উদ্দীন। আব্বাসউদ্দীনের সুর ও কণ্ঠে কোলকাতার গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানির হিজ মাস্টার্স ভয়েজ থেকে ১৯৩৫ সালে গানটি রেকর্ড হয়। এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে সিরাজগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে এ গানটি কৃষকদের কণ্ঠে অনেকবার নিবন্ধকারের শোনার সুযোগ হয়েছে। তখন অত্যন্ত দরদমাখা কণ্ঠে কৃষকের এ গানটি পরিবেশন করতেন। প্রায় চল্লিশ বছর পর তাদের একজনের কণ্ঠে কথিত গানটি শোনানোর জন্য অনুরোধ জানালে তিনি তা পরিবেশন করেন। কিন্তু তার কণ্ঠে সেদিনের সেই দরদ আর নেই। কারণ সেই কৃষি, সেই হাল-লাঙ্গল, সেই পরিবেশ আর নেই। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ঘটেছে আমুল পরিবর্তন। গানটি আমাকে গেয়ে শুনান উল্লাপাড়া থানার চরতারাবাড়িয়া গ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ জনাব আশরাফ আলী সরকার। গানটি শুদ্ধভাবে পরিবেশনের জন্য আমি জনাব মোস্তফা জামান আব্বাসীর স্মরণাপন্ন হলে তিনি টেলিফোন আবৃত্তি শুনান। আমরা গানটির কয়টি পংক্তি এখানে উল্লেখ করতে পারি :

ও বাজান চল যাই চল মাঠে লাঙ্গল বাইতে
গরুর কাঁধে লাঙ্গল দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ঠেলতে ॥
সকাল হতে সন্ধ্যা কাটে মাঠে লাঙ্গল বাইতে
কতনা দুখ সইতে, কাঁদার মাঝে রইতে
তবু কেন পাই না খেতে (আমরা) পার কি কেউ কইতে ॥ ...

মোরা মাটি ভূঁরে ফসল ফলাই/পাতাল পাথার হইতে
সব দুনিয়ার আহার যোগাই/আমরা না পাই খাইতে।
বউ দিয়েছে গলায় দড়ি/ভূখের জ্বালা সইতে
গেছে ধরা হইতে, কবর খানায় রইতে
তাই সারাটা দিন মাটি খুঁড়ি তারি দেখা পাইতে ॥ ...

গানটি রচিত হয়েছিল একেবারে নিরেট লোকভাষায়। লোকজীবনের সঙ্গে কবির আত্মিক সংযোগ ছিল বলেই এত দরদ দিয়ে গানটি রচনা করতে পেরেছিলেন। লোকমানস ও লোকচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল কবির অধীত। তাই কবি যুগ যুগ ধরে লালিত কৃষকের মনোযন্ত্রণার কথা তাদেরই ভাষায় অনন্য দরদ দিয়ে ব্যক্ত করতে পেরেছেন। এছাড়া কবি নিজেও ছিলেন সামন্ত সমাজের এক কৃষক পরিবারের সন্তান এবং পরাধীন দেশের নাগরিক। এ গানের মর্মবানীতের যে হতাশ-বেদনা এবং একই সঙ্গে সূক্ষ্ম প্রতিবাদের প্রশ্ন জড়িত সেটাই আমাদের সমাজ গবেষণার উপাদান। হতশা-বেদনার সঙ্গে প্রতিবাদের প্রশ্নে আছে বলেই না এ গান এত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। উদ্ধৃত গানটির উপাদান সামন্ততান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতি। এখানে শোষণ, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ছিল নিত্যসাথী, ফলে গানের বক্তব্য শ্রেীদ্বন্দ্ব ও শ্রেণীশোষণের আভাস থাকাটাই স্বাভাবিক।

সঙ্গীত ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক সর্বদাই বিদ্যমান, তবে তা কোনো নির্দিষ্ট গাণিতিক সূত্রে আবদ্ধ নয়। শোষণ, নির্যাতন, লাঞ্ছনা একটি সংহত ও বিকাশমান সমাজের নিত্যসাথী, সেটা সামন্তসমাজ বা বুর্জোয়া সমাজ উভয় সমাজেরই চিত্র। অর্থনৈতিক শোষণ ক্রিয়াশীল বলেই তার মধ্যে প্রতিবাদের সুর, একটি শোষণমুক্ত সমাজ

কামনা লোকসমাজ সর্বদাই সঞ্জিবীত। সমাজমাসসের, লোকসমাজের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা রয়েছে সঙ্গীত সৃষ্টিতে। লোকসমাজের আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ তাদের সঙ্গীত। সঙ্গীত সৃষ্টিতে একমাত্র যে অংশটা তার উৎপাদন শক্তিরূপে বিবেচিত হতে পারে তা হলো স্বতঃস্ফূর্ততা, যার সাথে সামাজিক মধ্যস্থতার রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সঙ্গীতের ব্যাখ্যা এবং পুনঃসৃষ্টি সমাজের সাথে তাকে ঘনিষ্ঠ করে তোলে এবং সেজন্য সঙ্গীতের সমাজতত্ত্বে এর বিশেষ গুরুত্ব। অর্থনৈতিক বিশ্লেষণেরও মূল কেন্দ্রবিন্দু হবে এ বিষয়টা। অর্থনৈতিক ভিত কিংবা সমাজ ব্যবস্থা ঠিক কিভাবে সঙ্গীতের সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির সাথে যুক্ত, সেটাই গভীর আলোচনার বিষয়বস্তু। কেবল কিছু কাঠামোগত সাদৃশ্য খুঁজে বের করাতেই সঙ্গীতের সমাজতত্ত্বের কাজ হয়ে যায় না, বরং তাকে দেখাতে হবে যে কেমন করে সামাজিক পরিবেশ মূর্ত হয়ে ওঠে বিশেষ ধরনের সঙ্গীতে।[১৭]

আমরা এ প্রসঙ্গে বাউল গান নিয়ে আলোচনা করতে পারি। বাউল সাধনা মূলত দরিদ্র, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষের মধ্যে প্রচলিত। বাউল মতদর্শে মানুষকে জীবনেই স্বাদ গ্রহণ করতে হয়। তারা বলে মৃত্যুর পরপারে কোনো স্বর্গ নরক নেই; বরং ইহজীবনের সুখের আস্বাদনে আছে স্বর্গ সুখ-দুঃখে নরক যন্ত্রণা। অথচ মানুষ এক বিরল ক্ষমতার অধিকারী। রিপু ইন্দ্রিয়গুলিকে সে বশীভূত করতে পারে এবং পরিচালিত করতে পারে। সাধনার দ্বারা মানুষ পেতে পারে দীর্ঘ জীবন, সুখ ও শান্তি। বাউল সাধনা নারী-পুরুষের যুগল সাধনা, এ সাধনায় নারী ও পুরুষের সমান গুরুত্ব। কিন্তু সন্তান জন্ম নিষিদ্ধ। বাউল বৈরাগী নয়, বরং জীবনের অনুরাগী। তারা অনুমান মানে না, তারা মানে বর্তমানকে, অর্থাৎ তারা প্রত্যক্ষবাদী-বস্তুবাদী। তারা মানবদেহের মধ্যে সন্ধান করে সুখ এবং মহানন্দ। কিন্তু লালন শাহ, দুদ্দু শাহ, দুর্বিন শাহ প্রমুখ বাউলের কতিপয় গানে আর্থ-সামাজিকতার প্রতিচ্ছায়া বাস্তবানুগভাবে চিত্রিত হয়েছে। এসব গান সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলা যায়। যেমনঃ

এমন সমাজ কবে গো সৃজন হবে
হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান জাতি গোত্র নাহি রবে'

অথবা

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে
লালন বলে জাতের কিরূপ দেখলাম না দুই নজরে

এখানে জাত বিভেদের ধারনাকে রীতিমতো ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়েছে। জাতি-গোত্র, উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্রের যে চিত্র তা তার গানে প্রতিবাদের সুরে ব্যক্ত হয়েছে এবং অদূরভবিষ্যতে এক শ্রেণীহীন নতুন সমাজের আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। দুদ্দু শাহের গানেও এমনিভাবে সমাজ প্রতিবিম্বিত হয়েছেঃ

১. ধলা কালার একই বীজ ভাই
সর্বজাতি যাতে হয় উদয়
কর্মগুণে এই সমাজে ভিন্ন গোত্র
আখ্যা পাই।
দীন দুদ্দু বিনয় করে কয়
আমার কোনো জাতি গোত্র নাই
দিয়ে মানুষের দোহাই মানুষের গুণ গাই।

২. শূদ্র, চাঁড়াল বাগদী বলার দিন
দিনে দিনে হয়ে যাবে ক্ষীণ
কালের খাতায় হইবে বিলীন
দেখছিরে তাই।

বেসারা সুফিদের মাধ্যমে ভারতে প্রাচীন বস্তুবাদী চিন্তার সমন্বয়ে সৃষ্ট বাঙ্গলার লোকধর্মই জন্ম দিয়েছে প্রাগ্রসর চিন্তার বাউল ধর্ম। স্থান ও কালের পটভূমিকায় ভারতীয় বস্তুবাদের অংশ হিসেবে এ চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। যুক্তিবিজ্ঞানের স্রষ্টা ভারতীয় বস্তুবাদীগণ। নানা ক্ষুদ্র জলধারা যেমন নদীতে পরিণত হয়, তেমনি নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

গোষ্ঠী মিলিত হয়ে ভারতীয় বস্তুবাদের কায় গঠন করেছিল।[১৮] ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে ভারত ইতিহাসের প্রতি পর্যায়েই লোকায়ত বা চার্বাক, কাপালিক, নাস্তিক, পাষণ্ড প্রভৃতি নামে বস্তুবাদীদের খুঁজে পাওয়া যায়। চার্বাকের মতে বর্ণভেদ নাই, পাপ পুণ্য নাই, কর্মফল নাই, স্বর্গ-নরক নাই, পরলোক, জন্মান্তর নাই, ঋষি নাই, দেবতা নাই, প্রত্যক্ষের বাইরে কিছুই নাই।[১৯] বাঙ্গলার বাউলরা প্রত্যক্ষবাদী, তাঁরা অনুমান মানে না। তাই তাদের গানে বস্তবাদী জীবনদর্শন প্রতিস্থাপিত। সাম্প্রাদায়িক অশুভতার বিরুদ্ধে তাদের জীবনদর্শন। সঙ্গীতের সমাজতত্ত্বের বিশ্লেষণে তাই তাঁদের গান অপরিহার্য উপাদান।

লালন শাহ ও তাঁর শিষ্য দুদ্দু শাহের গানে চিরাচরিত শাস্ত্রাচার প্রচলিত সমাজ ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়েছে। তাদের বক্তব্যে বিশ্বজনীন মানবতাবাদের পরিচয় ফুটে উঠেছে। লালন বলেন[২০]:

মাটির টিবি কাঠের ছবি/ভূতভাবে সব দেব দেবী
ভোলে না সে এসব রূপি/ও মানুষ রতন চেনে ॥
জিন-ফেরেস্তার খেলা/ পেঁচাপেচি আলাভোলা
তার নয় হয়না ভোলা/ ও যে মানুষ ভজে দিব্যজ্ঞানে ॥

এখানে কর্ম এবং মানব মহিমাকে সর্বোচ্চ আসন দেয়া হয়েছে। মাটির টিবি, কাঠের পুতুল বা পাথরের কোনো মূর্তি বা দেবতার পূজা বাউল করে না। বরং অচেতন মূতি পূজাকে বিদ্রুপ করে বাউল বহু গান রচনা করেছেন। তার সাধন-ভজনে দেব-দেবী, শাস্ত্রমূর্তি অগ্রাহ্য হয়ে প্রাধান্য পেয়েছে মানবদেহ। লালনের জীবনদর্শন সমকালের মানুষকে ভাবিত করেছিল। জাতিধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি দৃঢ়ভাবে জাত-বর্ণের অসারতা ব্যক্ত করেছেন:

সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবন।
লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান ॥

অথবা,

জগত বেড়ে জাতির কথা/ লোকে গৌরব করে যথাতথা
লালন সে জাতির ফাতা, ডুবাইছি সাধু-বাজারে॥

বাউল কোনো ধর্মীয় ব্রত, পূজা বা উপবাস করে না; ধর্মানুষ্ঠান, প্রার্থনা বাউল জীবনাদর্শ বিরোধী। দুদ্দু শাহর ভাষায় "বাউল মানুষ ভজে, যেথায় নিত্য বিরাজ"। তিনি হিন্দুদের ঠোকাঠুকি এবং মুসলমানদের সমস্ত মেকিগুলি পরিত্যাগ করতে পরার্মশ দিয়েছেন। তিনি নাম, মালা, ডোর, কৌপীন ধর্মীয় পোশাককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন বেদ, বেদবিধি এবং বৈদিকতার বিরুদ্ধে বাউল গান মুখর। বিকাশ চক্রবর্তী বাউল গানের সমাজতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলেন:

> বাউল গানের প্রসঙ্গ টেনে বলা যায় যে বাউলের ভাব-বিদ্রোহ ছিল সমগ্র বাংলার সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। বাংলার সব জায়গাতেই বাউল গান পাওয়া যায়। তাই এই গান কোন আঞ্চলিকতার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় যদিও স্থানভেদে তার প্রকাশভঙ্গির ভিন্নতা আছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান বাংলাদেশের বাউল গানে ভাটিয়ালি, উত্তরবঙ্গের বাউল গানে বাওয়াইয়া এবং নদীয়া জেলার বাউল গানের সুরে কীর্তনের প্রভাব ধরা পড়ে। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও সামাজিক কারণেই একটা সুরের কাঠামো কোন অঞ্চল বিশেষের সাথে একাত্ম হয়ে যায়। এক কথায়, মানুষের জীবনচর্চার মধ্যে থেকেই উঠে আসে লোকসঙ্গীতের সুর। বিভিন্ন পদকর্তার রচনায় প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও বাউল দর্শনের একটা কেন্দ্রীয় ভাব রয়েছে। তাই সমস্ত বাউলের কাছে বাউল গানের একটা নিজস্ব আবেদন আছে, যদিও ব্যক্তিগত উপলব্ধিবোধের তারতম্যের জন্য তত্ত্বের সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ায় প্রার্থক্য থেকে যায়।[২১]

সমাজতাত্ত্বিক বিবেচনায় সমাজে ধর্মের বিকাশ এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া। সমাজের বিবর্তনের অনিবার্য শর্ত হিসেবেই ধর্মের উদ্ভব; কোনোভাবে প্রকৃতি ও সমাজ বহির্ভূত কোনো শক্তি ধর্ম উদ্ভবের ক্ষেত্রে ক্রীয়াশীল নয়। ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় বারবার প্রমাণিত হয়েছে যে, সমাজপতিরা তাদের শাসন প্রক্রিয়াকে বৈধতা দানের জন্য ব্যবহার করেছেন মানুষের অন্তঃ করণের মর্মমূলে নিহিত ধর্মবোধকে, এ ধর্মবোধ আর কিছু নয়, এটা প্রকৃতি সৃষ্ট ভায়-ভীতি এবং সামাজিক জীবনে নিপীড়ন-নির্যাতনের হাত থেকে মানুষের আত্মরক্ষার উপায়-যা একান্তভাবে স্বার্থান্বেষী মহলের সৃষ্টি।[২২]

দরিদ্র ও শোষিত মানুষই লোকগীতির জনক-ধারক-বাহক। তাই এ শিল্পে তাদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সার্থক প্রতিফলন ঘটাই স্বাভাবিক। লোকগীতির চেতনা প্রতিবাদী, মানবপ্রেম এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। লোকগীতিতে সমাজজীবনের প্রকাশ ঘটে কখনো স্পষ্ট, কখনো রূপকের অন্তরালে কিংবা তত্ত্বের ছদ্মবেশে। বিশুদ্ধ শিল্প-প্রেরণার কিংবা নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টির কারণে লোকগীতির জন্ম নয়, এর পশ্চাতে রয়েছে মানবতাবাদী ভাবনা, জীবন-অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাবোধ। রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে লোকসাহিত্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,- "গ্রাম্য সাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবি, গ্রামের স্মৃতির অভ্যন্তরে কৃষক, দিনমজুর ও স্বল্প আয়ের মানুষের ক্ষয়, শোষণ, নির্যাতন, বেদনা ও তাদের হাহাকারের সুর সমাজ অভিজ্ঞতার জারকরসে জারিত হয়ে লোকগীতিতে রূপ নেয়, তাই লোকগীতিতে প্রস্ফুটিত হয় দুঃখী মানুষের বেদনার কথা, আবার একই সঙ্গে তাদের আকাঙ্ক্ষারও প্রতিচ্ছায়া এতে চিত্রিত হয়।[২৩]

সামন্ত-শোষণ আর তার সূত্রে প্রাপ্ত ধারাবাহিক দারিদ্র্য গ্রাম বাঙলার চিরকালীন চিত্র। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কালকেতু উপাখ্যানে বর্ণিত খুদ-কুড়া খেয়ে ফুল্লরার জীবনযাপন, ফুল্লরার বারমাসের দুঃখের বর্ণনা, ভারত চন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনির "আমার সন্তান থাকে ধুধে ভাতে'র প্রার্থনা, সুকান্তের "ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি"র কাব্যিক ব্যঞ্জনা বাঙলার দরিদ্র্যতারই ছায়াচিত্র। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর থেকে (১১৭৬/১৭৭০ খ্রি.) শুরু করে বাঙলার মানুষ অন্তত একডজন দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতনে জর্জরিত এই কঠিন-কঠোর বাস্তবের অধিবাসী এই বাঙালি। বিশেষত লোকগীতির স্রষ্টা সমাজের দুঃখী মানুষ, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তারা নানাভাবে নিষ্পেষিত-নিগৃহীত।

অধিকাঠামোমুলক সমাজের চিত্র-চরিত্র লোকগীতির মর্মবাণীতে বিধৃত। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে শ্রেণীসমাজের দারিদ্র্যের গর্ভে প্রতিবাদস্বরূপ লোকগীতির জন্ম। বিগত ২০০০ বছরের ইতিহাসের দিকে একবার নজর দিলে দেখা যায়, শাসক-শোষিতের দ্বন্দ্ব, ধনী-দরিদ্রের সংঘাত, সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং তার সহযোগী আমলাগোষ্ঠী বনাম আমজনতার মধ্যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব সমাজের এক অনিবার্য প্রক্রিয়া। অর্থনৈতিক নিস্পেষণের ফলে সাধারণ গ্রামীণ মানুষের সচেতনতা কিভাবে এক গাঢ় রূপ পেয়েছে তার অপূর্ব নিদর্শন নিম্নোক্ত গান:

ভাইরে দ্যাশে আছে দুইডা জাত
একটা থাকে রাজ পাটেতে
আরেকজনের দুঃখেতে প্রাণ ফাটে।
ও ভাই চিনির লাইগা পথ্য হয় না
কেউ বা কায় মিছরি পাক।

অথবা

ভাইরে থাকা হল না দ্যাশে
বড় লোক সব বড় হইল কাঙাল গরিব শুষে।

এখানে দ্বান্দ্বিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ এবং শ্রেণীচরিত্রের আসল রূপটি সরল ব্যাখায় প্রকাশিত। লোকগীতিতে বিধৃত শ্রেণীসমাজের সংঘাতের বিষয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন:

'আমাদের দেশে একটা কথা আছে ধান ভানতে শিবের গীত। আদতে কথাটা ছিল ধান ভানতে মহীপালের গীত। সে যাহোক মহীপালের বা শিবের গীত গাওয়ার সঙ্গে ধান ভানার মধ্যে প্রসঙ্গহীনতা ও বৈপরীত্যই যাঁরা দেখেন তাঁরা লোকসাহিত্যের খাঁটি সমঝদার নন। ছাদ-পিটাতে গিয়ে যদি দল বেঁধে গান করে:

ও আমার চান্দের কণা আন্ধাইর কইর‍্যা কই গেলিলো
আন্ধার কইর‍্যা কই গেলিলো পাগল কইর‍্যা কই গেলিলো।
তোর লগি যাইমু ঢাকা
বাক্স ভইর‍্যা আনম টেকা
দোতালাতে রাখবো তোরে খেড়ী ঘরে রাখবো না লো ॥
কিন্যা আনমু ঢাকাই শাড়ি
পিন্ধ্যা যাবি বাড়ি বাড়ি
রাস্তার লোকে দেইখ্যা তোরে বুক থাপড়াইয়া মরবে ওলো ॥

তাহলে তা অপ্রাসঙ্গিক নয় মোটেই। ছাদ-পিটানোর শ্রমে, অন্যের পাকাদালান গড়তে গড়তে তাদের নিজের কামনাকেই প্রক্ষেপ করছে-যা এই ধনতান্ত্রিক সমাজে কোনোদিন পূর্ণ হবার নয়।'

এরকম আমাদের জনপ্রিয় ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া গান রয়েছে যার মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণের চিত্রজাল রূপায়িত। এমন কি আধ্যাত্ম গানের উদাহরণ হিসেবে পরিচিত ভাটিয়ালি গান 'মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে/আমি আর বাইতে পারলাম না/ আমি সারা জনম বাইলাম বৈঠারে/নদীর কুল কিনারা পাইলাম না' গানটিতেও শ্রেণী শোষণের চিত্র বিদ্যমান। এ গানের মর্মবাণীতে রয়েছে জীবনযুদ্ধে পর্যুদস্ত মাঝির জীবনের গভীর দীর্ঘশ্বাস ও বঞ্চনার প্রতিফলন। বাস্তবে সুখের মুখ দেখবে বলে তাদের মনে ছিল বড় আশা, কিন্তু সে আশা তার পূর্ণ হয়নি বলেই তাদের পক্ষে এমনভাবে গেয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে।

এখানে ' নৌকা' বলতে জীবনতরী এবং 'মাঝি' বলতে অর্থনৈতিক কারণে ক্লিষ্ট সমাজের নিপীড়িত মানুষকেই আমাদের বুঝতে হবে। এরকম অনেক উদাহরণই দেওয়া যেতে পারে। যেমন ভাওয়াইয়া গান যে বেদনার ভাবটি ফুটে ওঠে তার উৎস সন্ধান করলেও দেখা যাবে যে সেখানে রয়েছে শোষণ ও বঞ্চনার কারণ ইতিহাস। কারণ দিনের পর দিন যে বাওয়াইয়া গানের নায়ককে তার স্ত্রী বা প্রেমিকাকে ছেড়ে দুরদুরান্তে কোনো ধনী ভূস্বামীর মজুর হিসেবে হাতি ধরা কিংবা গাড়োয়ানি কাজে নিয়োজিত থাকতে হয় তা তো অর্থনৈতিক কারণেই বা রুজি রোজগারের জন্যই। তাই ভাওয়াইয়া গান বিচারের সময়ে তাকে কিছুতেই পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বা গায়কদের শ্রম প্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত করে ভাবলে চলবে না একথা ভাওয়াইয়া গবেষকমাত্রই স্বীকার করবেন। এ প্রসঙ্গে আমরা ধান-কাটার গান, ফসল -বোনার গান, ছাদ-পেটানোর গান প্রভৃতি কথা বলতে পারি। কারণ এগুলি বিশ্লেষণ করলেই আমরা বুঝতে পারব যে শ্রম প্রক্রিয়া বিকাশের মধ্যে দিয়ে কিভাবে মানুষের মনে নান্দনিকতাবোধ ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। মার্কসের ভাষায়, 'শ্রমের দ্বারাই মানুষ প্রকৃতির প্রতি একটি মানবিক অনুভূতি ও ধারণা গড়ে নিতে পেরেছে।' এই শ্রমজীবী মানুষের কথায় লোকসাহিত্য পূর্ণ। লোকগীতির সিংহভাগই অধিকার করে রয়েছে শ্রমজীবী মানুষ।

সংহত সমাজের মানুষের দ্বারা সৃষ্ট এবং পরিবেশিত যে গান তাকেই আমরা সাধারণভাবে লোকগীতি বা 'Folk Song' বলি। লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতো লোকগীতিও লোকায়ত সমাজের দ্বারা মৌখিকভাবে প্রচারিত হয় প্রজন্ম পরম্পরায়। ব্যক্তির পরিবর্তে সমষ্টির সৃষ্টি রূপেই প্রতিভাত এসব সঙ্গীতে কোনো অঞ্চল, দেশ বা জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবিই মূর্ত হয়ে ওঠে।

আমরা আগেই বলেছি যে অর্থনীতি হলো ভিত্তি, তার ওপর ভর করেই গড়ে উঠে শিল্প, সাহিত্য -সংস্কৃতির উপরি কাঠামো বা সুপারস্ট্রাকচার। লোকগীতিগুলি বিশ্লেষণ করলেও আমরা সেকথার প্রমাণ পাই। আপাতভাবে হয়তো মনে হতে পারে যে লোকগীতির সঙ্গে অর্থনৈতিক উপলক্ষের কোনো সম্পর্ক নেই, নিছকই নান্দনিক প্রয়োজনে এর উদ্ভব, কিন্তু তেমনটি হলে বুঝতে হবে যে তা আলোচকের দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। লোকগীতি সৃষ্টি পেছনে শস্য-সংগ্রহ, নৌকা চালানো, শিকার করা, ফসল -বোনা এমন কতই না অর্থনৈতিক দিক কাজ করে থাকে তা বলাই বাহুল্য। সেইসঙ্গে জীবনাচরণের আরো নানা অনুষঙ্গও জড়িত থাকে।

অর্থনৈতিক উপলক্ষকে কেন্দ্র করে রচিত এমনই অসংখ্য লোকগীতির একটি হলো-

অকি, ওরে সাঙ্না মারিলু ক্যানে।
ভাতের দুখে ওরে সাঙ্না কাইনত বসিনু মুই
আজি কোন দোষেতে দুয়োর বান্ধি মারলু মোকে তুই
রে সাঙ্না মারিলু ক্যানে।

রাজবংশী সমাজে বিবাহিত স্বামী 'সাঙ্না' নামে অভিহিত হয়। এই প্রথার পেছনে জৈবিক কারণ যতই থাক তথাপি পেটের ভাতের কারণটিও অস্বীকার করা যাবে না। সেই পেটের তাড়নাতেই তার সাঙ্নার সঙ্গে ঘর বেঁধেছিল এবং তা সে পায়নি বলেই তাঁর ক্ষুব্ধ অনুযোগ উচ্চারিত হয়েছে এখানে।

জাতিভেদ প্রথা, পারিবারিক জীবনে বধূর ওপর শাশুড়ি-ননদের অত্যাচারের কথা, পণপ্রথার কথা প্রভৃতি অনুষঙ্গ উপস্থাপনের মধ্য দিয়েই বৃহত্তর লোকমানস তাদের প্রতিবাদী মানসিকতাটুকুকে সঙ্গীতে উপস্থিত করেছেন।

যেমন একটি গানে সেটেলমেন্টের কানুন বাবুর আচরণ নিয়ে বলা হয়েছেঃ

কানুন বাবুর আইন কড়া হে,
গরিব দুঃখী যায় ভুলে।
ভদ্র গেলে আসুন বসুন,
চেয়ার টেবিল দেয় তুলে।
গরিব গেলে কয়না কথা হে,
দিন দিন ঘুরিয়ে মারে।
ভদ্র গেলে পাঁচ খতিয়ান
একবার তড়াক ধরে।

গানটি একটি ভাদুগান । অনুরূপভাবে টুসুগানগুলি সম্পর্কেও বলা যেতে পারে যে, সেগুলি কেবল গ্রামবাঙলার নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের অভিব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, সমাজ চেতনা তথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণায় নিপীড়িত নারী-সমাজের বলিষ্ঠ হাতিয়ারও হয়ে উঠেছে যা পুরুষশাসিত সমাজকে যুগপৎ বিস্মিত ও চমৎকৃত করে। তবে এক্ষেত্রে একটি বিশেষ কথা বলার এবং তা হলো এই যে কেবল বাঙলার লোকগীতিই নয়, পৃথিবীর সব দেশের লোকসাহিত্যেই আমরা এই প্রতিবাদী সুরটি খুঁজে পাই।

সাধারণ মানুষের, খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনসংগ্রামের নির্যাস থেকে তৈরি হয় লোকগীতি। লোকগীতির বিষয়বস্তু বিভিন্ন হতে পারে এবং তা হয়ও; তবে আর্থ-সামাজিক বা ইহজাগতিক জীবনযন্ত্রণা এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সেটা কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল, এটি লোকগীতির জন্মগত বৈশিষ্ট। বাংলার লোকগীতিগুলো গভীরভাবে সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিতে বিলেশ্রণ করলে আমরা দেখতে পাব যে এ সঙ্গীতের মধ্যে রূপকের আড়ালে লুকিয়ে আছে বস্তুতান্ত্রিকতা অর্থাৎ জীবনযন্ত্রণা, জীবনের সংঘাত ও প্রতিবাদ। লালনের এক গানে আমরা পাই,

রাজেশ্বর রাজা যিনি/চোরের সেও শিরোমণি,
নালিশ করবো আমি/কোনখানে কার নিকটে।
গেল ধনমান আমার/খালি ঘর দেখি জমার,
লালন কয় খাজনারও দায়/কখন যেন যায় লাটে।

আমরা এই গানে দেখতে পাই কিঞ্চিৎ অপ্রত্যক্ষে বা আড়ালে লুকিয়ে আছে বস্তুতান্ত্রিক জীবনযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি।

শ্রমজীবী তথা সমাজের নিঃস্ব-রিক্ত-অসহায় মানুষেরা দু'টি ভাতের জন্য কি পরিশ্রমটাইনা করে। কিন্তু তাদের ইচ্ছা ঠিক ঠিকভাবে পূরণ হয় কি? যদি হয় তাহলে তাদের দারিদ্র্যময় জীবনকে অবলম্বন করে এত লোকগীতি আত্মপ্রকাশ করতো না। যেটুকু তারা উপার্জন করে তাও চলে যায় মহাজনের ধার শোধ করতে অথবা শোষক শ্রেণীর সীমাহীন লোভের শিকার হয়ে। বাড়িতে কুটুম এল তাই মাড়ভাত খাইয়েই আতিথ্য জানাতে হয়। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত মানুষের কান্নাই তাই ধ্বনিত হয়ে ওঠে একটি গানে এভাবে:

মুলুকে নাহি মিলে কাম কৈস্যে বাঁচে প্রাণ?
সাঝে খালে বিহানে হয় টান
পরের ঘরে পর খাটালি
সকাল হল্যেই যাই বাগালীরে
খ্যাটে খ্যাটে পিঠে বহে ঘাম কৈস্যে বাঁচে প্রাণ?
নওয়া গড়ের কুটুম অ্যাল
খাওয়া দাওয়া সর্যো ফেলরে
মাড়ভাতে রাখলই মান কৈস্যে বাঁচে প্রাণ।
জাও ছিল গুঁড়ি-গাঁড়ি, তাও লিল অ মহাজনেরে।
আইড়ে বসে ঝুরত নয়ান। কৈস্যে বাঁচে প্রাণ।

Have ও Have not শ্রেণীর মানুষের পার্থক্যটুকু এখানে চমৎকারভাবেই প্রতিফলিত। Have not শ্রেণীর দারিদ্র্যের কারণ আর কিছুই নয়, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অসাম্য আর বঞ্চনা। শ্রেণীসংঘর্ষ বা দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছে সভ্যতার রথ। সমাজে যারা ধনী তারা আরো ধনী হচ্ছে এভং গরিব হচ্ছে আরো গরিব। টাকার জোরেই আজ ন্যায়, বিচার-অবিচার, মূল্যবোধ সব হচ্ছে অপসারিত। একটি গম্ভীরা গানে এই সামাজিক বৈষম্যের কথাই উপস্থাপন করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, শিব এখানে দেবতার প্রতিভূ না হয়ে যেন প্রশাসনের মূর্ত প্রতীক রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে। কারণ গ্রামের নিরক্ষর বা তথাকথিত অশিক্ষিত মানুষগুলি তো আর প্রশাসন পক্ষকে পান না, তাই শিবের কাছে গম্ভীরা গানের মধ্যে দিয়েই নিবেদন করে নিজের শোষিত-পীড়িত-বঞ্চিত জীবনের সব দুর্গতির কাহিনী-

শিবহে, সিদ্ধিতে বেশ দম দিয়ে গাঁজা টেনে
আজ আছে ভালই সুখে
এদিকে কারও লেংটি, আবার কেউ মটর গাড়ী হাঁকে।
দুঃখ হয় তাই, জানাই তোমার
লীলা দেখে।

শোষণের চিত্রটি গানটিতে স্পষ্ট, স্পষ্ট শোষক ও শোষিত শ্রেণীর বৈপরীত্যটুকুও।

কৃষক-জেলে-জোলা-কলু-কামার-কুমার-ছুতার এসব নানা বৃত্তিজীবী মানুষই এ গানের জনক আর পৃষ্ঠপোষক। তাদের জীবনের নৈরাশ্য, বেদনা, অভাব, আশাভঙ্গ, দুঃখ, আক্ষেপ, বঞ্চনা এ সঙ্গীতধারায় প্রতিফলিত।[২৪]

প্রকৃতপক্ষে, "বাংলার অত্যাচারিত মানুষের মর্মকথাটি সর্বাপেক্ষা বেশি করে ফুটে উঠেছে লোকগীতিতে। লোগীতিতে অত্যাচারিতের প্রেমের ভাবনাটি যেমন স্পষ্ট করে ধরা পড়েছে, তেমনি প্রতিদিনের গ্লানি, আর্থিক অভাব-অনটন, এমনকি জোতদার-জমিদার-মহাজনের প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ পেয়েছে। কোনো কোনো লোকগীতি শুধু সাময়িক ঘটনা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, শোষণ-অত্যাচারকে কেন্দ্র করে পরিবেশিত হয়ে থাকে।[২৫]

লোকগীতির চরিত্র বৈশিষ্ট্য অনেকটা লোকধর্মজাত। লোকধর্ম হচ্ছে সর্বজনীন মানবকল্যাণের আকাঙ্ক্ষাপুষ্ট, লোকসমাজ থেকে উদগত উদারনৈতিক জীবনদর্শনের নানামাত্রিক নীতিকথার কথামালা। সমাজকাঠামোর বিভিন্ন পর্যায় এর উদ্ভব-প্রসার-বিনাস। আমরা লোকগীতির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করেছি যে, লোকগীতির চরিত্রধর্মের মধ্যেও একটা সর্বজনীন মানবকল্যাণের আকাঙ্ক্ষা নিহিত। আমরা অভিনব একটি ভাওয়াইয়া গান নিয়ে এখানে আলোচনা করতে পারি। আব্বাসউদ্দীন থেকে শুরু করে লতামুঙ্গেশকর পর্যন্ত অন্তত বিখ্যাত ছয়জন কণ্ঠশিল্পী এ গানটিতে কণ্ঠ দিয়েছেন। লতামঙ্গেশকরের কারুকার্যময় কণ্ঠে যখন গানটি আমরা শুনি তখন অনেক সময়ই আমরা এর মর্মার্থের দিকে আর মন দেই না অথবা সেদিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে ভূলে যাই। আমরা এ গানটিতে দেখি প্রকৃতি ও প্রেম একীভূত। এর মধ্যে মানব হৃদয়ের কি যেন একটা বঞ্চনার অব্যক্ত সুর ধ্বনিত। বিষয় ফান্দি, বগা আর বগি। কিন্তু যেন মনে হয় এ কেবল এক প্রতীকমাত্র। কবির অনুভূতির প্রগাঢ়তা যেন আকাশ ছোঁয়া। পুটি মাছের প্রতি বগা-বগির আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, ফান্দিও পুটি মাছের লোভ দেখিয়ে ফাঁদ দিয়ে পাখি শিকার করে এও যেন স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু এই মরণ-ফাঁদের ইতিহাস যেন অন্য কথা বলতে চায়। আমরা গানটি আগে পাঠ করি:

আজি ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
ফান্দ্ বসাইচে ফান্দিরে ভাইয়া পুটি মাছো দিয়া
মাছের লোভে বোকা বগা পড়ে উড়াল দিয়া রে ॥
ফান্দোতে পড়িয়ে রে বাগ করে টানাটুনা
হায় হায়রে কুঙকুরার সুতা হইল লোহার গুণা রে ॥
উড়িয়া যায়রে চকোয়া পাঙ্খী কয়া যায়রে ঠারে
তোমার বগা বন্দী হইচে ধরলা নদীর পারে রে ॥
এই কতা শুনিয়া বগী পাঙ্খা মেলিয়া দিল
ধরলা নদীর পারে যায়য়া দরশন দিল রে।
বগাক্ দেখিয়া বগী কান্দে রে, বগীক্ দেখিয়া বগা কান্দে রে ॥

আব্বাসউদ্দীনের গাওয়া জনপ্রিয় এ গানটি বাঙলার মানুষের হৃদয়ের গভীরে বাসা বেঁধেছিল সেই না বলা বাণীটুকুর জন্য। বঞ্চিত বাঙলার হতদরিদ্র কৃষক গানটি গাইত হৃদয় উতলানো দরদ দিয়ে-যেন তাদের বঞ্চনার সাথে বগা-বগীও একাত্ম-যেন ফান্দে তারা নিজেরাই বন্দি-কবি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বন্দি কৃষককুলের, বঞ্চিত জনমানুষের প্রাণের আকুতি কাব্যিক ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন।

এখানে কবির দরদি মনের কাছে মানুষে পাখিতে সব প্রভেদ ঘুচে গেছে। বিষয়ের অনন্যতা আর সুর-মাধুর্যের জন্যে গানটি ভাওয়াইয়া গীতিতে বিশেষত বাঙলা লোকগীতিতে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ফান্দির ফান্দে বন্দি বক, ধরলা নদী, পুটি মাছের টোপ, লোহার গুণা, চকোয়া পাখি এই যে প্রত্যক্ষ গোচর বস্তুনিচয় এসব যেন প্রতীকমাত্র। কিন্তু 'বগাক দেখিয়া বগী কান্দেরে, বগীক দেখিয়া বগা কান্দে রে' এই বেদনাঘন পরিবেশ, বেদনাঘন দৃশ্য এ যেন কৃষিজীবী, শ্রমজীবী, সামন্ত শোষণের পিঠে বাঁধা কৃষক-জনতারই এক বন্দি-চিত্রপট। কবির চিত্রকল্পও অনন্য কাব্যিকতায় প্রকাশিত হয়েছে। আতোয়ার রহমান লিখেছেন 'একটি আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনে আমি মধ্য এশিয়ার খ্যাতনামা কবি মীর্জা তুরসুনজাদাকে বলতে শুনেছি, এই গানখানিতে রূপকের

মাধ্যমে ধ্বনিক শ্রেণীর হাতে সাধারণ মানুষের নিপীড়নের কাহিনী বিবৃত হয়েছে।' সঙ্গত এবং যুক্তিগ্রাহ্য কারণেই আমরা তাঁর এ মতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করছি। এ গানটি সম্পর্কে সুখবিলাস বর্মা বলেছেন, 'ফান্দির ফাঁন্দে বন্দি একটি বকের বর্ণনা, ধরলা নদীর বর্ণনা, পুটি মাছের টোপের সাহায্যে বককে লোভ দেখিয়ে ধরা-ইত্যাদির মাধ্যমে একটি সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে। এই কারণে যে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছে-কিন্তু দুঃখের কথা, বক তখনও ফাঁন্দে বন্দী হয়ে রয়েছে। 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে'-এই গানটির বিশ্বজনীনতা ভাববার মতো। বর্তমান পরিস্থিতি-পরিবেশে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি সব কিছুতেই আমরা 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে' অবস্থার শিকার হয়ে রয়েছি।'

আমরা ভাওয়াইয়া গানের ভৌগোলিক অঞ্চলে মানুষের সীমাহীন দারিদ্র্যতার কথা জানি। সামন্ত শোষণের জাতাকলে, জমিদার ইজারাদারের অত্যাচারে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ তথা খরা-ঝরায় সেখানকার কৃষককুল ছিল জর্জরিত। কবিও এই অত্যাচারিত দারিদ্র জনতার সদস্য। কবি তাঁর নিজের বন্দিত্বকেই বগা-বগীর প্রতীকে প্রকাশ করেছেন। এখানে ঐ গানের সমাজতত্ত্ব হচ্ছে দু'শত-তিনশত বছর আগে রচিত এবং সমকালে কর্মক্লান্ত ঘামে ভেজা কৃষকদের কণ্ঠে এ গানের পরিবেশনে যে সমাজ চিত্রিত হয়েছিলঃ আর যে সমাজ বিম্বিত হয়েছিল গ্রামোফন রেকর্ডে আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে এবং অপেক্ষাকৃত অর্বাচিনকালে লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠে যখন এ গান পরিবেশিত হচ্ছে তখন শ্রুতিমণ্ডলী এর এক ভিন্ন স্বাদ উপভোগ করছেন। মনে করা যেতে পারে গানটি যেন নবজন্ম লাভ করছে। আমরা আগেই বলেছি সঙ্গীতের সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে জন্ম এবং পুনঃজন্মের বিষয়টি বিচার্য। দুই কালের পরিবেশনে বিম্বিত সমাজ কাঠামোর চিত্র-চরিত্রও ভিন্ন। পরিবেশন রীতি এবং পরিবেশনের স্থান-কাল সঙ্গীতের জন্ম এবং পুনঃজন্মের ও ভিন্নস্বাদ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এতদ্বত সত্ত্বেও সঙ্গীতের বিষয়বস্তু একই থেকে যায় বা থেকে যেতে বাধ্য। কেননা ঐ গান প্রণীত হয়েছিল সমাজকাঠামোর এক বিশেষ আর্থ-সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে। কাজেই সঙ্গীত সৃষ্টির সেই কালকেও আমাদের ভোলার জো নেই। শিকড়কে ভুলে গেলে বা অবজ্ঞা-অবহেলা করলে ঐ সঙ্গীতও একদিন মুছে যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

বাঙলার ভূপ্রকৃতি ও তার পারিপার্শ্বিকতায় গড়ে ওঠে জনজীবনে মর্মমূল থেকে উৎসারিত হয়েছে ভাটিয়ালি সুর ও তারই অনুষঙ্গে ভাটিয়ালি গান। ভাটিয়ালির উদাস করা সুরের ভেতর সামন্ত সমাজের শোষণের চিত্র, ভগ্ন ও নিষ্ফল জীবনের হাহাকার মাঝির কণ্ঠে ভেসে উঠেছে, যা শ্রেণী সমাজের চিরকালীন চিত্র।

ভাটিয়ালি গানে ব্যর্থ-বিপর্যস্ত জীবনের প্রসঙ্গে 'ভাঙা নৌকা'র রূপক বারবার এসেছে। ভাটিয়ালি গানে শোষণের চিত্রও স্পষ্ঠ:[২৬]

গুরু ও আমার সাতপুরুষের বাড়িখানা
তাতে জমিদারের খাজনা দেনা-ও
আমায় কখন জানি উচ্ছেদ করে-ও
খাজনার যমরাজা তহশিলদার ॥

যদি গানটির বক্তব্যকে তত্ত্বীয় রূপক হিসেবেও ধরে নেওয়া যায়, তাহলেও জমিদারের শোষণ আর তহশিলদারের অত্যাচারের প্রসঙ্গটি চাপা থাকে না। আবার মুরশিদ-সমীপে নালিশ-পেশের স্মারক নিচের এই পংক্তি ক'টিও বক্তার নিজের দারিদ্র্য-দুরাবস্থার প্রতিবেদন হিসেবে গ্রহণযোগ্য:

মুরশিদ ও - কারো বা আছে দালান গো কুঠা
আমার আছে ভাঙা ডেরা-ও
ডেরায় মেঘ মানে তুফান মানেনা-ও
শুনেন গো মুরশিদ...॥

ভাটিয়ালির উদাসী সুর জীবনের নিঃসঙ্গতা ও ব্যর্থতারই দ্যোতক। আর অবাঞ্ছিত ও নিপীড়িত জীবনের বেদনা প্রায়শই রূপকের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত কেননা, প্রতিপক্ষ যখন প্রবল ও পরাক্রান্ত, তখন নিরাপত্তার কারণে শোষণ-অত্যাচারের চিত্রাঅঙকনে তত্ত্ব বা রূপকের আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ভাটিয়ালি গান তার ভাবসম্পদ আহরণ করেছে মাঝি-মাল্লা-কৃষকের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, প্রেম- বিরহ, আনন্দ-বেদনা থেকে। ভাটির টানে, পাল তুলে নৌকা ছেড়ে দিয়ে সেই অলস মুহূর্তে মাঝি-মাল্লারা তাদের জীবনের কামনা-বাসনাকে সুরের ভাষায় প্রকাশ করে। এই পারিপার্শ্বিকতায় অত্যন্ত সহজসরলভাবে নিছক লৌকিক সুখ-দুঃখের সাথে মিশে গেছে তত্ত্বকথা:

সুজন নাইয়ারে ক্যামনে যাবি তুই ভবনদী বইয়্যা,
এত সাধের তরী পাইয়্যা
নষ্ট করলি তুই বাইচ খেলাইয়্যা রে।
ও তোর কাম নদীর ঐ নোনা জলে
নায়ের তক্তা যাবে খইয়্যা।[২৭]

লোকগীতির একদিকে যেমন আমরা পাই প্রকৃতি ও তার পরিপার্শ্ব, তেমনি পাই সামাজিক সমস্যার আলোড়ন। দৃষ্টান্ত হিসেবে ভাদু ও টুসু গাপনের নাম করা যেত পারে। টুসু গানের ভেতর লৌকিক তথা সামাজিক সমস্যার অবতারণাই প্রধান। ২৯ টুসু গানের মতো বারোমাস্যা গান, ছাদ পেটানো গান, জারি গান,-এসবের মধ্যেও পারিবারিক, আঞ্চলিক তথা সামাজিক সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়।[৩০] জারিগান মুসলিম সংস্কৃতি এক সাধারণ মিলনভূমিতে এসে সঙ্গত হয়েছে। এ সংস্কৃতির মিলন বিষেভাবে আমরা দেখতে পাই মুর্শির্দি গানে, সত্যপীরের পাঁচালীতে, গাজীর গানে এবং এ জাতীয় আরও কিছু কিছু বিক্ষিপ্ত গানের নমুনায়। মুর্শিদি গান বাউলেরই দেহান্ত রিত রূপ মাত্র। মুসলিম দরবেশদের গাওয়া সত্যপীরের গানের ভিতর হিন্দু দেব-দেবীর মহিমা প্রকীর্তিত। এদিক দিয়ে লোকগীতির বিচার করলে তার অশেষ কল্যাণকর সম্ভাব্যতা চোখে পড়বে। লোকগীতি বাঙলার সাংস্কৃতিক মিলনের শ্রেষ্ঠ একটি প্রতীক। এই প্রতীক চিহ্নটিকে যতো বেশি নিবিড়ভাবে আঁকড়ে থাকা যায় ততই আমাদের কল্যাণ। লোকগীতির সার্থকতা এখানে যে, তা এ সাংস্কৃতিক মিলনের কাজ সহজতর করবে। বাঙলার সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগে কিছু পরিমাণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু এই বিভাগটি সেই অশুভ প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।[৩১]

লোকগীতি নির্যাসিত হয় লোকসমাজ থেকে। লোকসমাজ কর্তৃক স্বীকৃত গীতিই লোকগীতি। অর্থাৎ লোকগীতি লোকমানসের জারক রসে জারিত; সমাজমানসই এর প্রতিপাদ্য। লোকগীতির সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সঙ্গীত ও সমাজের আন্তঃসম্পর্ক ধরা পড়ে। কিন্তু এটা জোর দিয়েই বলা চলে যে, সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে যতোটা উপলব্ধি করা সম্ভব ততটা সঙ্গীত পাঠে কখনোই সম্ভব নয়। বিশেষত সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে যতোটা উপলব্ধি করা সম্ভব ততটা সঙ্গীত পুনঃসৃষ্টির মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। শ্রোতামণ্ডলীর কাছে নতুন উপলব্ধি আসে, সঙ্গীতের ভাসা, সুরের কাঠামো, গায়কের নান্দনিক চেতনা ও পরিবেশের সাথে তার একাত্মতা প্রভৃতি মিলে যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়, সঙ্গীতের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় তাকে অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজন পড়ে। এ প্রসঙ্গে বিকাশ চক্রবর্তীর বক্তব্যটি উদ্ধৃত করা যায়:

সৃজনশীলতা, সুরের মাধুর্য, সৌন্দর্যসৃষ্টি, কল্পনাশক্তির কাছে আবেদন প্রভৃতি সমস্তকিছুকে ধরে নিয়েই বলা যায় যে সঙ্গীত তার পারিপার্শ্বিক প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারে না এবং এজন্যই বিশেষ কোনো সঙ্গীতের সৃষ্টি, বিকাশ ও অবলুপ্তি নির্দিষ্ট স্থান-কালের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয়ের মতো সঙ্গীতও তার আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে এবং স্থানকালের সীমাকে অতিক্রম করেও যেতে পারে;

তবেকোনোভাবেই তাকে ছিন্নমূল বলা যায় না। সমাজ নিরপেক্ষভাবে নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টিকে সঙ্গীতের একমাত্র উদ্দেশ্য বলা হলে সঙ্গীতের সামাজিক চাহিদার বিষয়টা কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' প্রবীন শ্রোতার স্মৃতিমেদুরতার তন্ত্রীতে আজও আঘাত করে কিন্তু এই জাতীয় গান নতুন করে আর তৈরি হতে পারে না। আর্থ-সামাজিক বিষয়বস্তু নিয়ে গম্ভীরা গান এখনও রচিত হয় যদিও 'স্বরাজ যদি পাই হে ভোলা/দিব তবে মাণিক কলা/নইলে আইঠ্যা কলা' তৈরি হয় না। সমাজ-মানস তথা সমকালীন আবেগের সাথে একাত্ম হতে না পারলে সঙ্গীতের দর্শন ও তার সাঙ্গীতিক প্রকাশের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি দৃঢ় হয়না।[৩২]

সঙ্গীতের সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে পুনঃসৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচ্য। একটি গান অর্ধশতক পরে কিংবা এক-দুই শতক পরে পরিবেশিত হয়, পরিবেশনের স্থান, পরিবেশনের কারণ, সমকালে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ঐ সঙ্গীতে বলা বক্তব্যকে দান করে নতুন মাত্রা, নতুন দ্যোতনা, তখন তাকে পুনঃসৃষ্টি বলা খুবই সঙ্গত এবং যুক্তিগ্রাহ্য। আমরা বাঙলার পুরানো দিনের অনেক লেকগীতি, অনেক কবিতা ও গান এবং নজরুল, সুকান্ত, রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট অনেক কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। অকুতোভয় দেশপ্রেমিক কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁসির প্রেক্ষাপটে রচিত লোকগীতি "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি" দেশবাসীকে কতটা অনুপ্রাণিত ও প্রণোদিত করেছিল এবং এখনও করে এটা আমরা সবাই জানি। এভাবে আমরা একগুচ্ছ নাম উচ্চারণ করতে পারি। যেমন, আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠে "আল্লা মেঘ দে পানি দে, ছায়া দেরে তুই।" লতা মুঙ্গেস্করের কণ্ঠে "ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সুকান্তের "রানার", ভুপেন হাজারিকার কণ্ঠে "দোলা, আঁকাবাকা পথে মোরা কাঁধে নিয়ে ছুটে যাই রাজা মহারাজাদের দোলা"। কুমার বিশ্বজিৎ-এর কণ্ঠে "জন্মিলে মরিতে হবে, ভবেরি রঙ্গ হেব সাঙ্গ সবাই/সাধেরই অঙ্গ তোমার মাটিতে মিলাবে" প্রভৃতি। একটি শিশুতোষ কবিতার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। যতীন্দ্র মোহন বাগীর "কাজলা দিদি" যখন প্রতীমা কুশোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গীত হয় তখণ নিঃসন্দেহে তার নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এমনি করে রবীন্দ্রনাথের "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে বাদল গেছে টুটি', সুকান্তের "দুর্মর" কবিতা "হিমালয় থেকে সুন্দর বন হঠাৎ বাংলাদেশ" এবং " হে মহাজীবন" প্রভৃতি কবিতা যখন গান হিসেবে পরিবেশিত হয় তখন যেন এগুলোর পুনঃসৃষ্টি সাধিত হয়।

সঙ্গীতের সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে বিচার্যের বিষয় হচ্ছে গানের "জন্ম এবং পুনর্জন্ম"। জন্মের স্থানিক ও কালিক প্রেক্ষাপট এবং পুনর্জন্মের স্থানকাল ও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিকতা। এই সৃষ্টি এবং পুনঃসৃষ্টির কালিক ব্যবধান এক দশক, দুই দশক, অর্ধশত, শতক থেকে পাঁচশত বছর বা হাজার বছর হতে পারে। একটি সঙ্গীত কালের চিত্র বুকে ধারণ করে বয়ে চলে কাল থেকে কালান্তরে। পুনঃসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় কোনো শিল্পী যখন উপযুক্ত স্থান-কালের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার গানে 'আপন মনের মাধুরী' সংযোজিত করতে পারে, তখন সেই গান নিছক বক্তব্য বিষয়ের সীমাকে অতিক্রম করে যায়, তাতে সংযোজিত হয় নতুন মাত্রা।[৩৩] এভাবে সঙ্গীত রচনাকার, সুরকার এবং কালে কালে এর পরিবেশনের, উপস্থাপনের বিভিন্নতার মধ্য দিয়ে সমাজ কাঠামোকে বিশ্লেষণের সুযোগ এনে দেয়। কাজেই লোকগীতির সমাজতত্ত্ব সমাজ বিজ্ঞান, ইতিহাস, নৃতত্ত্বের ও ভাষাতত্ত্বের অপরিহার্য উপাদান।

আমরা উপসংহারে বলতে পারি বাঙলা লোকগীতিতে বিধৃত হয়েছে। বাঙালির জাতিতত্ত্বের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। বাঙালির জীবনদর্শন বাঙলা লোকগীতির মর্মবাণী। বাঙালির জাতি পরিচয়ের দলিল বাঙলা লোকগীতি। লোকগীতি পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে বাঙালির জাতি মনের গতি-বিধি, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবধারার পারস্পরিক সম্পর্ক তুলে ধরা যায়। তাই নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ রীতির মাধ্যমে আমাদের লোকগীতির উদ্ভব ও প্রসারণের পটভূমি আলোচনা আবশ্যক। লোকগীতির নৃবিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ জাতি হিসেবে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দিবে নিসন্দেহে। কারণ

লোকগীতি বাঙালির প্রাচীন ঐতিহ্য ইতিহাস এবং বর্তমানের বাঙালির জীবন চেতনা ও ধ্যান-ধারণার সুস্পষ্ট নিদর্শক।

বাঙলার জীবন-চেতনাকে উপজীব্য করেই লোকগীতি রচিত ও বিকশিত। বাঙলার জলবায়ু, ভৌগোলিক পরিবেশ, বাঙালির মানস-প্রবণতা ও জীবনাচার নিয়ে এর জন্ম-পুষ্টি, লালন-পালন, ভরণ-পোষণ সব হয়েছে। লোকমানস, লোককথা, লোকধর্ম, লোকাচার এবং লোকগুণসমূহ লোকগীতির ভাষায় স্থান পেয়েছে। তাই তো বাঙলার লোকগীতির আবেদন সর্বজনীন। বাঙলার এই অমূল্য সম্পদ যা জাতীয় ঐক্য, সংহতি, জীবনবোধ ও সাহিত্যরূপে স্বীকৃত, সাহিত্যের এত বিশাল ভাণ্ডার অন্য কোনো জাতির আছে কি না এ বিষয়ে যথেষ্টে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আমরা এর নবমূল্যায়ন প্রয়াসী।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা লোকসাহিত্য* (তৃতীয় খণ্ড), পৃ. ২৬
২. ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস*, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা, চুতুর্থ সংস্করণ ২০০৩, পৃ. ২৭৬
৩. ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭
৪. সুস্মিতা পোদ্দার, *লোকসংস্কৃতি: ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১ম প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ৮৩
৫. দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শন* (১ম খণ্ড), (ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ৪র্থ প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ২০৫
৬. যতীন সরকার, *বাঙালির সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য*, (ঢাকা: ইউপিএল), পৃ. ১৪৮
৭. স্বামী তথাগতানন্দ, *মহাভারতের কথা*, (কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ৪র্থ মুদ্রণ, ২০০১), পৃ. ২৪৬
৮. যতীন সরকার, 'বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯
৯. উৎপলা গোস্বামী সম্পা, *সঙ্গীতমূল্যায়ন বক্তৃতামালা*, (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সঙ্গীত আকাদেমী, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৯), পৃ. ১০১
১০. উৎপলা গোস্বামী, 'সঙ্গীতমূল্যায়ন বক্তৃতামালা', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
১১. উৎপলা গোস্বামী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
১২. উৎপলা গোস্বামী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮
১৩. ইন্ডিয়ান ফোকলোর কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির মুখপত্র, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন ২০০৩, পৃ. ৮
১৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮
১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮
১৬. *লোকশ্রুতি*, (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ সরকার, ভলিউম-১, ইসু-২, জুন ২০০৩), পৃ. ৭০
১৭. 'লোকশ্রুতি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩
১৮. 'লোকশ্রুতি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯
১৯. শক্তিনাথ ঝা, *বস্তুবাদী বাউল*, (কলকাতা: লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ত্যথ ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গরাজ সরকার, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃ. ৪৫০-৫১
২০. 'লোকশ্রুতি', *প্রাগুক্ত*, জুন ২০০৩ পৃ. ৭৫
২১. 'লোকশ্রুতি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১

২২. 'লোকশ্রুতি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫
২৩. আবুল আহসান চৌধুরী, *লোকসংস্কৃতি বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭), পৃ. ৯
২৪. আবুল আহসান চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০
২৫. আবদুল হাফিজ, *বাংলাদেশের লৌকিক ঐতিহ্য*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী), পৃ. ২৯৭
২৬. আবুল আহসান চৌধুরী, *লোকসংস্কৃতির বিবেচনা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, (প্রাগুক্ত), পৃ. ১৩, ১৪
২৭. 'লোকশ্রুতি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬
২৮. নারায়ণ চৌধুরী, *সঙ্গীত পরিক্রমা*, (কলকাতাঃ ১৯৮৫), পৃ. ২৮২
২৯. 'লোকশ্রুতি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭
৩০. নারায়ণ চৌধুরী, *'সঙ্গীত পরিক্রমা'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৪
৩১. নারায়ণ চৌধুরী', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৫
৩২. 'লোকশ্রুতি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০
৩৩. 'লোকশ্রুতি', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০